নজরুল সাহিত্যে নারী

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

বি.এম. গুলশান আরা

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুলাই - ২০০৪

RB
বি
891.445
ARN

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাহিত্যে নারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রণীত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

বি.এম. গুলশান আরা

Dhaka University Library
401813

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুলাই - ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে বি.এম. গুলশান আরার এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য লিখিত ও উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ নজরুল সাহিত্যে নারী অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয় নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোন অংশও কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

401813

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ড. রফিকুল ইসলাম
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সৃষ্টির আলোতে উদ্ভাসিত বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত। সৃষ্টিশীলতার পরশমনির ছোঁয়ায় সৃজন করেছেন স্বর্ণময় রচনা সম্ভার। বহু বোধের, বহু মতাদর্শের সমাহার ঘটেছে তাঁর সাহিত্য কর্মে। সময়োপযোগী, বাস্তব সম্মত, সম্পূর্ণ নবধারার এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ মতাদর্শ সমূহের মধ্য থেকে একটি মাত্র অভিজ্ঞানের চয়ন আমার এ অভিসন্দর্ভ।

নজরুল সাহিত্যে নারী এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধনকৃত গবেষক হিসাবে এম.ফিল ডিগ্রী গ্রহনের জন্য রচনা করি। কাজী নজরুল ইসলামের নারী জাগরণের আন্তরিক কামনা, নারীর জীবন মান উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা, সামাজিক এবং পারিবারিক অবরোধ লাঞ্ছিত জীবন থেকে নারীদের বেরিয়ে এসে নব জাগরণের ধারায় সম্পৃক্ত হবার উদাত্ত আহবান, চিন্তা-চেতনা, বিচিত্র বিষয়ের বিবিধ অনুসঙ্গ উদঘাটন করাই ছিল এই অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য। 401813

একদা অন্তঃপুরবাসিনী নারীর জাগরণ, সেই জাগরণের ক্রমবিকাশের ধারা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। নজরুল ইসলামের সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে কেমন ছিল নারীর জীবন এবং তাদের জাগরণে, কারা কি ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন সে ইতিহাসও স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। নজরুল সাহিত্য সাধনায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন- দেশ-জাতি এবং সমাজের অর্ধাংশ নারীর অবস্থাকে। কি ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নারীজাতির প্রতি- তা সামান্য হলেও ধারণায় আনতে চেষ্টা করেছি।

এরপর ক্রমান্বয়ে তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন রচনা যেমন -- কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তিনি কিভাবে নারীকে জাগাতে চেয়েছেন তা আলোচনায় আনতে চেয়েছি। যে ভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ হওয়া উচিৎ ছিল হয়ত সে ভাবে বিশ্লেষিত হয়নি কারণ এ বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থের সহায়তা তেমন নিতে পারিনি। অনেক আলোচকই দুই-চার ছত্রে নজরুলের নারী বিষয়ক ভাবনা চিন্তা শেষ করেছেন। তাই নিজে অধ্যায়ন করে যা বুঝেছি সেটাই লিখতে হয়েছে।

তবে একথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি যে আমার এম.ফিল গবেষণার তত্ত্বাধায়ক ড. রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, মতামত, উপদেশ অভিসন্দর্ভ তৈরীতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে - সে সব আলোচনায় আনতে সচেষ্ট থেকেছি। গবেষণার শিরোনাম তাঁরই দেওয়া। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, অপরিসীম ধৈর্য, সহনশীলতা, নিরন্তর তাগিদ এই গবেষণায় আমার সকল প্রেরণার উৎস। তাঁর কাছে এ ঋণ চিরকাল অপরিশোধ্য থাকবে আমার।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় গ্রন্থাগারের মোঃ আমান উল্লাহ, রতন কুমার দাশ ও অন্যদের কাছে। যখন যে গ্রন্থ চেয়েছি, প্রয়োজনে তারা খুঁজে বের করে দিয়েছেন। এছাড়াও বাংলা একাডেমীর সদস্য হিসাবে একাডেমী কর্মকর্তাদের সহযোগীতা পেয়েছি- বই, পত্র-পত্রিকা দিয়েছেন তারা।

সবশেষে যাঁর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় তিনি আমার আব্বা কে.এম.রওশন আলী। আমার গবেষণায় তাঁর উৎসাহ তুলনাহীন।

স্বামী এবং পুত্রদ্বয়ের সহৃদয় সহযোগিতা না পেলে হয়তো গবেষণার মত দূরুহ কাজ করতে পারতাম না। তাদের আন্তরিকতায় সকল কষ্ট হয়ে উঠেছে সহনশীল - অনায়াস সাধ্য।

বি.এম. গুলশান আরা

২৩.০৬.২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়		
	নারী জাগরণ - ক্রম বিকাশের ধারা	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়		
	নজরুল পূর্ব যুগে বাংলা সাহিত্যেনারী	১৩
তৃতীয় অধ্যায়		
	নারী জাতির প্রতি নজরুলের দৃষ্টি ভঙ্গি	২৪
চতুর্থ অধ্যায়		
	নজরুলের কবিতায় নারী	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়		
	নজরুলের গল্প সাহিত্যে নারী	৬৭
ষষ্ঠ অধ্যায়		
	নজরুলের উপন্যাসে নারী	৭৯
সপ্তম অধ্যায়		
	নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ ও অভিভাষণে নারী	৯৭
উপসংহার		১০৪
সহায়ক গ্রন্থ		১০৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাগরণ - ক্রম বিকাশের ধারা

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাগরণ : ঐতিহাসিক পটভূমি

সাধারণতঃ লোক গাথা, লৌকিক ছাড়া, প্রবাদ প্রবচনে যে ভাবে যাপিত জীবন ধরা পড়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তেমন ভাবে ধরা পড়ে না । আশ্চার্যের বিষয় হলে ও সত্য যে আমাদের সমৃদ্ধ লোক সাহিত্যের এমন কোন দিক খুঁজে পাওয়া যাবে না - যে খানে নূন্যতম নারী স্বাধীনতার কথা - নারী জাগরণে কথা আছে । বরং দেখা যায় সে গুলোতে ফুটে উঠেছে নারী নির্যাতনের, নারীকে লাঞ্চিত-বঞ্চিত করার বিচিত্র সব কলা কৌশল । সে দিক বিবেচনায় রেখেই বলা যায় নারী নির্যাতন, নারী নিগৃহিত হওয়া,সম অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, সমতা অর্জনের আকাঙ্খার দ্বন্দ্ব সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীন এবং আদিমতম প্রক্রিয়া যা যুগের পরিবর্তনে হারিয়ে যায় নি: সময়ের সাথে ধারা বাহিক ভাবে চলে আসছে, পদ্ধতির তারতম্য হয়েছে - প্রক্রিয়া রয়েছে অবিচল।

এর থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা হয়েছে বার বার। মণীষীরা স্বীয় চিন্তা চেতনা, মমনের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন নারীর অবস্থার উন্নয়নে সফলও হয়েছেন ব্যর্থতার পাশাপাশি। তবে এই প্রচেষ্টার ধারা খুব প্রাচীন নয়। পশ্চাত্যে সতেরো দশক থেকে লিখিত ভাবে নারীরা তাদের নির্যাতিত শোষিত অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করতে থাকলেও প্রাচ্যে বিশেষ করে তৎকালীন ভারত বর্ষে এ ব্যাপারে সচেতনতার সূত্র পাত ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। পাশ্চাত্যের নূতন চিন্তা চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে প্রাচ্যের চিন্তাশীল মণীষীবৃন্দ সরাসরি না হলেও প্রচ্ছন্নে নারী মুক্তি, নারী জাগরণের ভাবনা ভাবতে শুরু করেন।

বহু যুগের সংস্কার কুসংস্কারে ভারতীয় তথা বাঙালী নারী ছিল অবরোধ বাসিনী । পণ-প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ, বিধবা বিবাহে অস্বীকৃতি নারীকে পুরুষের ক্রীড়ার বস্তুতে পরিনত করে রেখেছিল।শ্বাসরুদ্ধকর এ রকম পরিস্থিতি থেকে নারীকে মুক্ত করতে যাঁরা এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রাজা রাম মোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৬), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী (১৮৪৪-১৮৯৮), দূর্গা মোহনদাস (১৮৪১-১৮৯৭), এই সব ক্ষণজন্মা মণীষীদের।

Dhaka University Institutional Repository

এঁদের ঐকান্তিক আন্তরিকতায় সামাজিক সংস্কারের প্রবল বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। তারইফলশ্রুতিতে নারীরা শিক্ষা সংস্কৃতি সামাজিক সংগঠনের সংগে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রগতিশীল কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে থাকে।

রাজা রাম মোহন রায় প্রথম প্রতিবাদ জানালেন নারীর উপর যুগ যুগ ধরে চলে আসা নিষ্ঠুর এবং বর্বরোচিত সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার । তাঁর এই যুগান্তকারী প্রতিবাদ নারীর প্রতি সর্বোত্তর সহানুভূতির প্রথম প্রকাশ বলে ধরা যায়। এটা নারী জাগরণের সূচনাকে বেগবান করে। নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সহায়ক স্বীকৃত বলে বিবেচিত হয়।

১৮১৮ সালে হিন্দু সমাজের অমানবিক সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা নিবারণের আকাংখায় রাম মোহন রায় রচনা করেন 'সহমরন বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ প্রথম প্রস্তাব'। পরের বছর অর্থ্যাৎ ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় এই বিষয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব । শুধু মাত্র পুস্তক প্রকাশ করে যে কাজ হবে না তা বুঝতে পেরে ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়ে ১৮২৯ সালে আইন পাশ করিয়ে নিষিদ্ধ করান নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা। পরবর্তীতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারেও তিনি যথেষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্বদেশের তুলনায় সে দেশের মহিলাদের তুলনামূলক উন্নত অবস্থা দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন বাংলার নারীদের যদি এ রকম জেগে ওঠা সম্ভব হতো।[১] এই আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপ দিতে রাজা রাম মোহন রায় পরবর্তীতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাম মোহন ও তাঁর সম মানসিকতা সম্পন্ন কেশব চন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনার্থ ঠাকুরের - নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ ধর্মান্দোলনের যে পথ রেখা নির্মান করেন ক্রমে তা নারীমুক্তির দিক নির্দেশনা দান করতে থাকে। কিন্তু নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের এক অংশে সচেতনতা জেগে উঠলেও মহিলাদের শিক্ষা এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সে কালের ঐতিহ্যিক সমাজের বিরুধিতা ছিলো সুতীব্র।[২] বিরোধীতায় প্রচেষ্টা থেমে গেল না এবং জোরদার হলো । সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে অবরোধ প্রথাদূর করা, স্ত্রী শিক্ষা চালু করার জন্য প্রবক্তারা বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে উঠলেন । কলকতার নারী হিতৈষী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষার সূচনা হয় ১৮৪৯ সালে । এ বছরের মে মাসে জে.ই.ডি বেথুন কলকাতায় স্থাপন করেন ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল, পরে বেথুন স্কুল নামে এই স্কুল পরিচিতি লাভ করে। তখন ও পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধীতা ছিল প্রচন্ড এবং ব্যাপক। সে জন্যই সরকারী আনুকূল্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও বেথুন স্কুল দীর্ঘ দিন পর্যন্ত খুব সীমিত সাফল্য লাভ করেছিলো। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে হলেও এগিয়ে আসতে লাগলেন অবহেলিত নারী সমাজ । ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, হিন্দু মেয়েরা শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতিও লাভ করলেন। স্কুল কলেজের ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন করলেন। রক্ষনশীল গোঁড়াদের সমস্ত প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু (ব্রাহ্ম) প্রথম মহিলা স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের অনন্য সাধারণ গৌরব লাভ করেন। এর পরের বছরই ১৮৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীদের মধ্যে প্রথম এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন চন্দ্রমুখী বসু (খ্রীষ্টান)। শুধু ডিগ্রী অর্জন করেই এরা সন্তুষ্ট থাকেন নি স্বাবলম্বী হবার জন্য ঊনিশ শতকের শেষ ভাগেই চাকুরীতে যোগদান করেন। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতীয় তথা বাঙালী নারীদের একটি অংশ শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যায় পুরুষের পাশাপাশি। নিজেদের অধিকার আদায় করা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন কি ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসী আন্দোলনেও নারীরা অংশ গ্রহণ করতে পিছ পাহয় না।

হিন্দু অন্তঃপুর বাসিনীগণ যখন তাদের সমাজ সংস্কারের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বহিরাঙ্গনে পদ চারণা শুরু করেন। ঠিক তখন সেই সম সাময়িক সময়ে বাংলার মুসলিম নারীদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক। তারা ছিল কঠোর পর্দার অন্তরালে অবরোধ বাসিনী, জ্ঞানের আলো বির্বজিত, কুসংস্কার আচ্ছন্ন অক্ষম এক জনগোষ্ঠী । বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে পর্দাপ্রথা তাদের অগ্রসর জীবনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া তৎকালিন মুসলিম আলেম সমাজ কলকাতা মাদ্রাসার মৌলভী জনাব আব্দুল হাকিমের মত মনে করতেন, 'যে কাজটি মুসলমানেরা করতে সক্ষম নয় তা হলো অন্যজাতির মত তারা তাদের নারীদের স্কুল কলেজে পাঠাতে পারে না । কারণ ধর্মত তারা তাদের নারীদের পর্দাপুষিদা মত রাখতে বাধ্য '।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময়ের বিখ্যাত মুসলিম সমাজ সংস্কারক যেমন নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান প্রমুখ মুসলমান পুরুষ সমাজের সমস্যা সমূহ নিয়েই এত অধিক বিব্রত ছিলেন যে নারীদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ তাদের ছিল না ।[৫]

তবে ১৮৯৯ সালে মুসলিম চিন্তা বিদ সৈয়দ আমীর আলী কলকাতার সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে বলেছিলেন,[৬] - 'মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলা উচিত। তাহাতেই সমাজে একটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব প্রতি ফলিত হতে পারে। পুরুষ নারী উভয়েই যদি সমভাবে উন্নতি করতে না পারে তবে কোন সার্থক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'[৭] প্রগতিশীল হিন্দু সমাজ সংস্কারকদের মত মুসলমান সমাজেও তখন কয়েক জন ক্ষণ জন্মা মণীষীর আর্বিভাব হয়। তাঁদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ। মুসলিম নারীদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার আগে সমস্যা জর্জরিত মুসলমান সমাজকে শিক্ষা সংস্কৃতিতে এগিয়ে নেবার চেষ্টায়ব্রতী হন। নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩) প্রতিষ্ঠা করে।[৮] কলকাতার শরিফ মুসলমানদের চিন্তার জগতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। পুরুষ শাষিত সমাজে পুরুষরাই যখন অনগ্রসর তখন মহিলাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

সৈয়দ আমীর আলী প্রগতি পন্থী উদার মতাবলম্বী হওযা সত্বেও নারী শিক্ষা সম্বেন্ধে সভা সমিতিতে আলোচনা ও দুই একটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া নারী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি । মুসলিমনারী শিক্ষার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে পুরুষের চেয়ে নারীই এ ব্যাপারে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সাথে স্মারণ করতে হয় নওযাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর (১৮৪৮-১৯০৫) নাম। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৯৯ সালে অনুধাবন করেন। 'মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরাল ভাবে চলা উচিত'। কিন্তু ভাবনা বাস্তবায়নে তিনি সক্রিয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি । বরং সৈয়দ আমীর আলীর চেয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেসা বেশী অগ্রসর ছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সালে স্থাপন করেন কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়। অবাক করার মত কথা হলেও সত্যি যে সে সময়ে কলকাতাতে ও মুসিলম মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। ফয়জুন্নেসা বিভিন্ন নারী হিতৈষী সংগঠনের সাথেও যুক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৫৫-১৯৩২) প্রতিষ্ঠিত 'সখি সমিতি'তে তিনি দুইশত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।[৯] এছাড়া মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অশিক্ষার মরুভূমিতে সামান্য বারি সিঞ্চনের প্রয়াস চালিয়ে ছিলো ।[১০]

১৮৬৩ সালের আগষ্টমাসে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রকাশ করে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মেয়েদের অগ্রতির পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখাতে শুরু করে । ১৮৬৫ সালে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় বিবি তাহেরন নেসার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয়কে দেখা এই চিঠিতে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যদি এই ধরা ধামকে আপনাদের প্রকৃতই সুধাধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যাভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টাপান।'[১১]

'বামাবোধিনী' পত্রিকার উদ্দেশ্যই ছিল বামাদের উন্নতি এবং সম্ভাবত এ পত্রিকাতেই প্রথম বারের মত 'স্ত্রী স্বাধীনতা'[১২] শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বামাবোধিনী পত্রিকার জরিপ থেকে জানা যায় ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালালয়ে ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলিম বালিকা ছিল।[১৩]

বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল নিষেধাজ্ঞার শামিল। এই কারণে পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায় পর্দা প্রথার সাথে বাল্য বিবাহ, দারিদ্র্য,ধর্মীয় বিধি নিষেধ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা প্রয়াসের অন্যতম আন্তরায় হিসেবে কাজ করে। ১৮৮৪ সালে যখন চন্দ্রমুখী বসু এম,এ পাশ করেন তখন মুসলমান মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দোর গোড়াতেও যেতে পারেনি । ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'নারী শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী দুঃখ করে লিখেছিলেন, 'দেশে এ পর্যন্ত একটি মুসলিম বালিকা ও মেট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয় নাই ।'[১৪]

নারী শিক্ষার এই দুরাবস্থা, অনিশ্চিত পরিস্থিতি, সমাজের হাজারো বাধা প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করে শিক্ষার আলোক বর্তিকা হাতে এগিয়ে আসেন মুসলিম নারী

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন । অসামান্য প্রতিভাধর এই নারী ব্যক্তিত্ব বাংলার মুসলিম নারী জাগরণে এক বলিষ্ট ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ১৯১১ সালে মুসলমান বালিকাদের জন্য তিনি স্থাপন করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। তিনি তাঁর মেধা, চিন্তা, চেতনা, কর্ম এবং সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মুসলমান নারীদের শিক্ষা দীক্ষায় নারীকে শোষণ, বঞ্চনা, সামাজিক নিপীড়ন এবং অবরোধ থেকে মুক্ত করতে আজীবন কাজ করেন এবং অধিকার সচেতন করতে জীবন উৎসর্গ করেন।

বেগম রোকেয়ার কর্ম প্রেরণা, বুদ্ধি দীপ্ত চিন্তা সম্পন্ন শানিত সাহিত্য সৃষ্টি সব মিলিয়ে নারীর জীবন-নারী শিক্ষা কার্যক্রমকে একটা গৌরবময় পর্যায়ে পৌছে দেয়। তাঁর জীবদ্দশাতেই পূর্ব বঙ্গের কৃতি ছাত্রী মিস ফজিলাতুন্নেছা ১৯২৭ বাঙালী মুসলমান নারীদের মধ্যে প্রথম এম, এ, পাশ করে নারী শিক্ষাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যান। গণিত শাস্ত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আরো উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। দেশে ফিরে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

বেগম রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত তাঁর আরেক ছাত্রী শামসুন্নাহার মাহামুদ ১৯৩৫ সালে মেয়েদের ভোটের অধিকার আন্দোলনে যোগদেন; এর আগে ভারত বর্ষে নারীদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতার কাউন্সিল হাউসে বাংলার নারীদের প্রতিনিধি হিসাবে ইন্ডিয়ান ডেলিমিটেশন কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেয় । এই সাক্ষ্যদানের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের ভোটাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলে শুধু ভোট দেবার অধিকারই মেয়েরা পেল না তাদের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসন সংরক্ষিত হলো ।[১৫]

যে মহিলারা একদিন বাড়ির মধ্যে নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য মহিলার সামনে আসতে পারতেন না তারাই পরবর্তীতে শিক্ষার আলোতে এসে পর্দার বেড়া জাল অতিক্রম করে। সভা সমিতি গঠন, পত্র পত্রিকায় লেখা লেখি শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের 'সওগাত' পত্রিকার অবদান বিশেষ ভাবে স্মারণীয় । ১৯২৯ সালে মহিলাদের লেখা ও ছবি নিয়ে প্রকাশিত সওগাত মহিলা সংখ্যা একটি বলিষ্ঠ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ ।

Dhaka University Institutional Repository

এতে করে গোঁড়া মুসলমানদের দ্বারা নাজেহাল হলেও সওগাত তার প্রচেষ্টা অব্যহত রেখে মুসলিম লেখিকা তৈরীতে ও নারী আন্দোলনে সাহায্য করেছে।[১৬] এছাড়া ১৯৪৭ সালে সওগাত সম্পাদকের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা 'বেগম' - যা আজ ও নিজস্ব বৈশিষ্টে চালু আছে।

দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে নারী নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে তার যোগ্যতা প্রমানের সাক্ষর রেখে চলেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অংশ গ্রহণ করেন। সক্রিয়ভাবে পঞ্চাশ দশক থেকে বেতার টেলিভিশনে অংশ গ্রহণ করছেন নিয়মিত।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মুসলিম সমাজের নারী মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়নি বরং বেগবান হয়ে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের খোঁজে। মহিলারা রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা, অর্থনৈতিক ভীত নির্মাণে, শিল্প কারখানায়, সাহিত্য সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

(১) নারী মুক্তি আন্দোলন, লিয়াকত আলী (সম্পা), পথিকৃত প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১, পৃঃ ২২

(২) রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া - নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ৭ / গোলাম মুরশিদ

(৩) রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, পৃঃ ৭ / গোলাম মুরশিদ

(৪) নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ৪৪

(৫) নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ৪৪

(৬) নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ৪৪

(৭) নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ পৃঃ ৪৬

(৮) ঊনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা / ওয়াকিল আহমদ

(৯) সখি সামতি, ভারতী ও বালক পৌষ, ১২২৮ পৃঃ ৫০৫-৫১৭

(১০) বাংলার বিদ্বৎ সভাঃ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ওয়াকিল আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সপ্তাম সংখ্যা ১৯৭৮ পৃঃ ১২৫-১২৬।

(১১) প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা বিধি তাহেরণ নেছা, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ২১-২২ বর্ষ, (১ম-৪র্থ সংখ্যা) ঢাকা ১৩৮৩-৮৪, পৃঃ ৭৬

(১২) রাস সন্দুরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, গোলাম মুরশিদ / বাংলা একাডেমী , ঢাকা -১৯৯৩ পৃঃ ১০

(১৩) নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, ঢাকা -১৯৯৩ পৃঃ ১০

(১৪) মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, আনিসুজ্জামান / মুক্তধারা, ঢাকা । ৩য় প্রকাশ ১৯৮৩ পৃঃ ৩৬৮-৬৯

(১৫) শামসুন নাহার মাহমুদ - আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, পৃঃ ৩২

(১৬) রেখাচিত্র - আবুল ফজল / পৃঃ ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল পূর্ব যুগে বাংলা সাহিত্যে নারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি নজরুলের জন্মের আগেই ঊনিশ শতকে নারী জাগরণের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সমাজে নারীর আবস্থার উন্নতির জন্য রাজা রাম মোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ বহু মনীষী এগিয়ে এসেছিলেন। নানা প্রকার কুসংস্কার অপসারণ করে নারীর জীবন উন্নয়নে সফল ও হয়েছিলেন তাঁরা । হিন্দু মেয়েরা তাদের প্রচেষ্টায় মুক্তি পেয়েছিলেন সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা থেকে পেয়েছিলেন বিধবা বিবাহের অনুমতি ।

ধীর গতিতে হলেও কুসংস্কার এবং অবরোধের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাইরে আসতে শুরু করেছিলেন তারা। তখন মেয়েদের প্রকাশ্যে লেখাপড়া করার জন্য বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট হবার গৌরব অর্জন করে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৮০ সালে। অর্থাৎ নজরুলের জন্মের ১৯ বছর আগে।

মুসলমান মেয়েরা এই প্রগতির সাথে সমান ভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন নি পুরুষের সহযোগীতার অভাবে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত উদার মানসিকতা সম্পন্ন মণীষী মুসলমান সমাজ এসেছিলেন ৫০ বছর পরে। তখন তাঁদের চিন্তা ভাবনায় ধরা পড়ে যে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষা ছেলেদের সাথে সমান্তরাল ভাবে চলা উচিৎ। এরই মধ্যে যে বছর কাদম্বিনী গাঙ্গলী গ্রাজুয়েশন প্রাপ্ত হন সে বছরই জন্ম গ্রহণ করেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। চিন্তা চেতনায়, মেধা-মননে, রোকেয়া যেন তমসার অন্ধকারে আলোর দ্যুতি। শুধু কথায় নয় কর্ম দক্ষতায় এই মহিয়সী নারী বাংলার মুসলিম মহিলাদের জাগরণে অসমান্য অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন নারী মুক্তির প্রেরণা দাত্রী। নারী শিক্ষা প্রবর্তনে সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণকারী। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে নারীকে অধিকার সচেতন, স্বাতন্ত্র বোধ এবং স্বাধীনচেতা করে তুলতে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

বেগম রোকেয়ার তৎকালীন যে পরিস্থিতি থেকে বাংলার নারী সমাজকে আলোর পথে আনতে সচেষ্টা হয়েছিল তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন যে মুসলমান মেয়েদের মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই পর্দা করতে হত। শুধু পুরুষদের সামনেই না বাড়িতে আগত দূর সম্পর্কের মহিলা আত্মীয়দের সামনে ও তাদের

Dhaka University Institutional Repository

যাবার নিয়ম ছিল না । সে কারণেই তাঁর উপলব্ধি 'গোটা ভারত বর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকা দিগকে অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরানী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রী লোক দেখিতে পায় না।'[১১]

কেবল রোকেয়ার বর্ণনাতেই নয় তাঁর সমসাময়িক আরেকজন নারী দরদী, নারী জাগরণে সদা সচেষ্টা ব্যক্তিত্ব সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দিনও লিখেছেন মুসলিম নারীদের দুরাবস্থার কথা । তিনি সওগাতের প্রতিষ্ঠা যুগে মুসলিম নারীর অবস্থা বর্ননা প্রসঙ্গে লিখেছেন--

- নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কার বদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিন্ড বৎ করে রেখেছিল।
- মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বাংলা শিক্ষার বিরুদ্ধেও সমাজের কঠোর নির্দেশ বলবৎ ছিল। মেয়েদের বাংলা শিক্ষাদানকে অনেক মুসলমান ধর্ম বিরোধী কাজ বলে মনে করতেন।
- অশিক্ষা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীদের জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরোধের কঠোরতা এদের কর্ম শক্তিকে পন্ড করে রেখেছিল। মেয়ের বয়স পাঁচ বছর হলেই ঘরের বের হতে দেওয়া হত না।
- বাল্য বিবাহ প্রথা অত্যাধিক পরিমান চালু ছিল ।
- গুরুত্বর অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হত না পর্দা নষ্ট হওয়ার এবং দোজখে যাওয়া ভয়ে।
- খান্দানী ও অর্থশালী লোকেদের পত্নী ছিল তাদের ভোগের বস্তু । গরীব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীরও অধম।
- কাঠোর অবরোধের নিগ্রহ ছাড়াও উৎপীড়ন অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা ছিল সে যুগের নারীদের সারা জীবনের সঙ্গী।
- স্বামীর খেয়াল খুশী অনুযায়ী বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হত।

Dhaka University Institutional Repository

- মুসলিম সমাজে নারীদের জন্য ইসলামের বিধান ছিল কার্যত অচল। সমাজে তারা তারা সমাজে তারা গৃহপালিত এবং গৃহে আবদ্ধ জীব বিশেষ রূপে পরিগনিত ছিল। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদাও স্বাধীনতা দিয়েছে বাংলার মুসলিম সমাজ সে অধিকার থেকে জোর পূর্বক তাদেরকে বঞ্চিত রেখেছিল।[২]

সেই সময়ের আরেকজন সমাজ সচেতন মুসলিম লেখক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। তিনি তাঁর লেখার তৎকালিন নারীদের অসহায়ত্বের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। মুসলমান নারীদের পর্দা, অবরোধ এবং নিরক্ষতার বিরুদ্ধে তিনিও ছিলেন সোচ্চার । তাঁর 'স্ত্রী শিক্ষা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'নারী জাতির শিক্ষা, শক্তি এবং সমর্থ্যই হইতেছে জাতীয় জীবনের মেরুদন্ড স্বরূপ । নারী জাতি না জাগিলে, নারী জাতি না উঠিলে জাতীয় উন্নতি কদাপি সম্ভব নহে। অকারণে নারী জাতিকে সদা সর্বদা অন্তঃপুরে বন্ধ রাখা কি রূপ ভীষণ ও ভয়াবহ পাপ, তাহা একবার চিন্তা করিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। ..... এই অস্বাস্থ্যকর অন ইসলামিক পাপ প্রথা কেমন করিয়া আমাদের সমাজ দেহকে পাচইয়া তুলিতেছে এবং স্ত্রী লোক দিগের শিক্ষার পথে কিরূপ কন্টাকারোপন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।'[৩] নারীর এই অসহানীয় অবস্থা উন্নতি কল্পে তিনিও অবরোধ প্রথার অবসান কামনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, 'আমাদের এই পরাধীনতা, মুর্খতা এবং অনভিজ্ঞতার প্রধান কারণ হইতেছে অবরোধ । সুতারাং অবরোধ প্রথাকে বিলুপ্ত করিলে স্ত্রী দিগের চরিত্র, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞতা লাভের সংগে সংগে আরো উন্নত, পবিত্র এবং উজ্জ্বল ও সরল হইবে।'[৪]

তাঁর এই সব বাস্তব ধর্মী অকপোট সত্য ভাষণের জন্য সনাতন পন্থী রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ অনেক বিরোধীতা করেছিল। তবে আশার কথা এই যে, রক্ষণশীলদের বিরোধীতা সত্বেও জাগরণের এই গতিধারা থেমে থাকেনি। সমাজের সব ভ্রুক্রটি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসেন সচেতন মণীষীগন। মুসলমান মেয়েদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য আরো যাঁরা আবদান রাখেন তাদের মধ্যে সৈয়দ এমদাদ আলী, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লুৎফর রহমানের প্রচেষ্টা ও তৎপরতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁর সমস্ত জীবনই তিনি উৎসর্গ করেছেন সমাজে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে, নারীকে মূল্য নূতন ভাবে মূল্যায়ন করতে। বেগম রোকেয়াকে সভানেত্রী করে 'নারীতীর্থ' (১৯২২) নামে তিনি একটি নারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অসহায় নারীর স্বাধীন জীবন যাপনের পথ করে দিয়েছিলেন। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল দুঃস্থ ও পথভ্রষ্ট নারীদের উদ্ধার ও পূণর্বাসন। সংসার এবং সমাজ জীবনে নারী পুরুষের সেবা দাসী হয়ে পরমুখাপেক্ষী জীবন যাপন করুক তা তিনিচান নি । তিনি চেয়েছিলেন নারীর আর্থিক স্বাধীনতা পুরুষের সমকক্ষতা । শিক্ষা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ছাড়া নারীর নিজ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে না, তারা আপন সন্তানকেও উপযুক্ত মানুষ হিসাবে গড়তে পারবেনা।[৫] নারীর চিত্ত বিকাশও আত্মোন্নতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানে মুখপাত্র হিসেবে 'নারী শক্তি' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এসব কাজ করতে গিয়ে অন্যান্যদের মত লুৎফর রহমানকেও রক্ষণশীল সমাজের নিন্দা কুড়াতে হয়েছে।

সাহিত্যে নারী চরিত্র চিত্রণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্য যুগে নারীর জীবন ছিল ব্যক্তিত্ব হীন। চর্যাপদে দেখা যায়না কোন উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন নারী। ডোম্বিনী শারবী, ধীবারী নারী, চরিত্র গুলোর পেশা ছিল গর্হিত। এতই গর্হিত যে তারা নগরের বাইরে বাস করত । কোন উচ্চ বিত্ত কিংবা মুসলমান নারীর সন্ধান চর্যাপদে নেই। মধ্যযুগে যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় নারী চরিত্র পাওয়া যায় সে গুলোতেও নারীত্বের মহিমা ও স্বাধীনতা ফুটে উঠতে পারে নি।

মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে সাহিত্যে নারীর নানা মাত্রিক রূপ অংকিত হয়েছে। আধুনিকতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে নারী হয়ে উঠেছে মানবিক গুনাবলী সমৃদ্ধ ব্যক্তিতময়ী রূপে। আধুনিকতা এবং সাহিত্যের গতির সাথে বৃদ্ধি করতে থাকে নারীর ব্যক্তি স্বতন্ত্র ।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বেনারীর প্রতি দৃস্টি ঐঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে অল্প অল্প করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭০) ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি

Dhaka University Institutional Repository

'মেঘনাদ বধ' কাব্য ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারী চরিত্রকে উপস্থাপন করেন অভিনব রুপে। সনাতন বারতীয় ঔতিহ্য ও পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত নারী স্বাধীনতার সংমিশ্রনে তিনি নারী চরিত্রগুলোকে রূপায়ন করেন। নারীকে নারীর মহিমায় বসিয়ে নারীর নতুন ঐাবমূর্তি নির্মান করেন মাইকেল।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এর ঠকচাচী একটি জীবন্ত চরিত্র। ঠকচাচী হিংসা-ক্রোধে সমন্বিত এক বাস্তব নারী চরিত্র। সারা উপন্যাসে ঠকচাচীর প্রত্যক্ষ ছবি একবার অল্প সময়ের জন্য সামনে আসে, কিন্তু তাতেই দাগ কেটে যায়।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩২-১৮৯২) তাঁর উপন্যাস সমূহে ব্যাপকভাবে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রকাশ এবং বিকাশ ঘটিয়েছেন। যদিও তাঁর চিত্রিত চরিত্র গুলোর বেশির ঐাগই এসেছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। 'দুগেন্তশনন্দিনীর' আয়েষার নিজ প্রণয় সম্পকিস্তত স্বাধীন উচ্চারণ 'দেবী চৈধুরানীর' সংসার সীমার বাইরে দুঃসাহসী কর্মকান্ড নারীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার জাগরণ স্বপ্নে আন্দোলিত। 'কপাল কুন্ডলার'র মতিবিবি, পরিচালিকা পেষমন, 'চন্দ্রশেখর'-এর দলনী বেগম, কুলসুম, 'রাজসিংহ'-এর দরিয়াবিবি, জেবউন্নিসা - প্রত্যেকেই স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল। তবে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ নির্দেশিত মূল্যবোধ বঙ্কিম চন্দ্র কলনই সম্পূর্ন ভাবে ত্যাগ করেন নি।

মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন তাঁর সাহিত্য কর্মে অনেক গুলো মুসলিম নারী করেছেন তাদের মধ্যে জয়নব, জায়েদা, দৌলতননেসা, তাহমিনা, নুরুন্নেহার উল্লেখ যোগ্য। মীর সাহেবের সৃষ্টি শৈলীর কারণে এরা বাঙালী মুসলমান নারী হয়ে উঠেছে।
রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশাল অঙ্গন জুড়ে বিচিত্র নারী চরিত্রের সমাবেশ। সৃষ্টি নৈপূণ্যে তারা সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত। নারী সম্পর্কে ঊনিশ শতকীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনেথের মধ্যেও ছিল - নারী স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতা নিয়ে রবীন্দ্রনেথের চিন্তা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও- শেষ পর্যন্ত তিনি সচেতন ভাবেই সে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে নারী মুক্তির সপক্ষেই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং নারী সত্তার স্বাধিকারের দাবি তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার

হে বিধাত--
যাবনা বাসর কক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী'

নারী শুধু পুরুষের ছায়া অনুসারী নয়, সেও চায় কঠিন জীবন সংগ্রামে পুরুষের সাথে আংশীদার হতে। 'সংকটের দুরূহ চিন্তার' ভাগ সেও নিতে চায়। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই বোধেকে তুলে ধরেছেন। নারী জীবনের মর্মবেদনা, সংসারের চাকায় বাঁধা এক ঘেঁয়ে জীবনের যন্ত্রনা এবং তার থেকে মুক্তির কথাও তিনি তাঁর কবিতায়, গানে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যেমন 'যোগাযোগ' , 'চতুরঙ্গ', 'চার অধ্যায়' বেশ কয়েকটি ছোট গল্প যেমন 'স্ত্রীর পত্র', 'ল্যাবরেটরী', 'বদনাম' ইত্যাদিতে নারীর স্বতন্ত্র সম্পর্কে নুতন উপলব্ধি ও মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের দিয়েছিলেন প্রাণ ভরা সহানুভূতি দিয়েছিলেন স্বপ্ন, কল্পনা ও আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের এই উদার মানসিকতা পরবর্তীতে অনেক লেখককে সহানুভূতির সাথে নারী চরিত্র উপস্থাপনায় উৎসাহিত করেছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যয় (১৮৭৬-১৯৩৮) লিখেছিলেন 'নারীর মুল্য'। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সেই মুল্যবোধে থাকেন নি তাঁর সাহিত্যের নর-নারী সবাই পুরনো মূল্যবোধ ও প্রথাগত ধ্যান ধারনার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের সামনে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুসলিম লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের রচিত সাহিত্যে ব্যাপক ভাবে উঠে আসে মুসলিম পরিবারিক জীবন এবং সহৈ সাথে মুসলিম নারী চরিত্র। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মজিবুর রহমান সাহিত্য রত্নের (১৮৬০-১৯২৩) 'আনোয়ারা', ডাঃ লুৎফর রহমানের 'রায়হান' ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায় নান্দিনী',

Dhaka University Institutional Repository

কাজী ইমদাদুল হকের 'আব্দুল্লাহ' । এ সব উপন্যাসে নারীর পারিপার্শ্বিক জীবন ছাড়াও ব্যক্ত হয়েছে নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা এবং নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার কথা।

শত সাহিত্যিকের সাধানায় বাংলা সাহিত্য যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন সাহিত্য সাধনায় আত্ম নিবেদন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ধূমকেতুর মত সাহিত্যঙ্গনে তাঁর আর্বিভাব। ।ভাষা শৈলী-আঙ্গিকে তিনি স্বতন্ত্র। কিন্তু অবাক করার মত ব্যাপার এই যে ভাব গত এবং বিষয় ভিত্তিক কোন কোন ক্ষেত্রে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাথে তাঁর বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে নারীর কল্যাণ কামনায় শিক্ষা দীক্ষায়, অবরোধ-পর্দার বিলোপ সাধনে সমাজে কাঠমোল্লার দৌরাত্ম, পুত্র কন্যায় প্রভেদ না করা, নারী পুরুষের সম অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে এই দুই মণীষীর সাজুয্য রয়েছে। রোকেয়ার উন্নয়নশীল চিন্তা চেতনা যে নজরুলের উপর প্রভাব ফেলেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। বরং বলা যায় রোকেয়া ও নজরুল বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রথম আলোকবাহী। ধ্বংস ও নির্মানের কাজ এঁরা একই হাতে করেছেন। দুজনের মতাদর্শে ছিল আশ্চর্য মিল।

এছাড়া 'কল্লোল' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নারীত্বের উদ্বোধন, তার মর্যাদার প্রকাশ, নারী স্বাধীনতার প্রসংগও এসেছে নিয়মিত এসব প্রকাশনাও নজরুলের নারী ভাবনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। কেন না সে সময় ঐ সব লেখার ফলশ্রুতিতে সমাজে কিছুটা হলেও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। সংকীর্ণ এবং অনুদার পরিবেশ কেটে গিয়ে একটা নতুন আলোর আভা দেখা দেয়।

'সওগাত' সম্পাদক তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি চারণে জানিয়েছেন, 'সাধারণ ভাবে তিনি নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং নারী জাতির উন্নয়নের ব্যাপারে প্রায়ই আলোচনা করতেন।'[৬] সৌমেন্দ্র নাথ লিখেছেন, 'লাঙলে বের হলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। একদিনের মধ্যে লাঙল সব বিক্রী হয়ে গেল, সেই সংখ্যা আমাদের আবার ছাপাতে হলো। নজরুলের কবিতাই ছিল লাঙলের প্রধান আকর্ষণ।'[৭]

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে 'নারী' কবিতা নারী বিষয়ে পরবর্তীতে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সমাজে এক ধরনের গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টি করেছিল তা বলাই বাহুল্য। নজরুল শুধু কবিতাতেই নয় গল্প, উপন্যাস, নাটকে তাঁর নারী বিষয়কমতামত চিন্তাভাবনা দিয়ে নারী প্রগতির ধারাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

(১) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'রোকেয়া রচনাবলী' আব্দুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম মুদ্রণ ১৯৯৩ পৃঃ ৪৩৩

(২) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন 'সওগাতের প্রতিষ্ঠা যুগে মুসলিম নারীর অবস্থা'

(৩) মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান বিষয় বিবিধ স্বজন, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ: ১৮

(৪) মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান বিষয় বিবিধ স্বজন, পৃঃ ১৯,

(৫) মোহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'- আহাম্মদ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা- পৃঃ ১৫৮

(৬) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন 'সওগাত যুগে - নজরুল ইসলাম', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা-১৯৮৮, পৃঃ ২৫৮

(৭) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সমকালে নজরুল ইসলাম', বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩ পৃঃ ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাতির প্রতি নজরুলের দৃষ্টি ভঙ্গি

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণের কবি নজরুল যুগ চেতনার ধারক বাহক তিনি । জীবনের যে দিক থেকেই ডাক এসেছে প্রত্যাশ পূরনের লক্ষ্যে সেখানেই সারা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। পিছিয়ে পড়া ঝিমিয়ে থাকা মুসলমান সমাজ কে জাগাতে তাঁর মত আর কেউ এগিয়ে আসেন নি । সে হিসেবে কাজী কবি মুসলিম জাগরণের কবি।

তারুণ্য দীপ্ত যৌবন উচ্ছল নজরুল আরেক জাগরণের কবি - তাহলে নারী জাগরণ । নারীর বিচিত্র অনুসঙ্গ - তাঁর চিন্তা চেতনায় সাহিত্যে বরাবরই লক্ষ্যনীয় ভাবে উস্থাপিত হয়েছে । বাঙালী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পাশ্চাৎ পদতা বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই ছিলেন সোচ্চার। অবহেলিত অন্তঃপুরবাসি বাংলার হত ভাগ্য নারী সমাজ কে জাগাতে তিনি যে ভাবে আন্তরিকতার সাথে আহবান জানিয়ে ছিলেন তেমনটি আর কারো মধ্যে দেখা যায় না, কি তাঁর আগে অথবা পরে। সমাজে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নজরুলের আবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মারণ যোগ্য । লাঞ্ছিত নারী সত্তাকে জাগাতে তিনি এমন আহবান করেন যেন তা ধর্মীয় বাণীর মত পবিত্র এবং সর্বজন সমাদৃত। নজরুল যখন বলেন,-

'সাম্যের গান গাই -
আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই ।'[১]

তখন ইসলামের সেই অমীয় বাণী 'নর ও নারীতে কোন পার্থক্য নেই - তারা একে অপরের পরিপূরক' এই কথাই মনে করিয়ে দেয় । নারীর সমাধিকার প্রশ্নে নজরুল দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,-

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

-পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টার ফল এই সুন্দর বিশ্ব । মহান সৃষ্টির মূলে নারী প্রেরণারূপী, প্রেরণা দাত্রী । নজরুল নারীদের মধ্যে আবিস্কার করেছেন বিশ্বের শুভ শক্তি, মঙ্গলময় মহিমা। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন নারীর কল্যাণময়ী রূপকে।

'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী
সুষমা লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি ।'

Dhaka University Institutional Repository

নারী আপন অন্তরের সুধায় সংসারকে করেছে সুন্দর সুমধুর । আপন স্বভাবের সংরক্ষনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতায় সচল রেখেছে সৃষ্টির নবধারা । নারী জন্ম দায়িনী শস্য মাতা, সৃষ্টির মূল প্রেরনায় রয়েছে নারীর অপরিহার্য অবদান। নারীর বিচ্ছেদ বিরহে, নারীর মধুর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর অমর কাব্য সাহিত্য । অসংখ্য গান, কবিতা, গল্প। ইতিহাস পড়লে আমরা দেখি পুরুষের আত্ম বিসর্জন এবং বীরত্বের কথা কত না মহিমান্বিত করে লেখা হয়। কিন্তু নারীর অবদান সে ভাবে কেউ লিখে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। কবি বড় বেদনার সাথে লক্ষ্য করেন কত নারী যুদ্ধে স্বামী-সন্তান হারিয়ে অসীম দুঃখ অসহনীয় যাতনা ভোগ করে ইতিহাসে তা লেখা থাকে না । অথচ জগতের বড় বড় জয় বড় অভিযানের পেছনে রয়েছে নারীর আত্ম ত্যাগের অলিখিত অশ্রুগাথা ।

'কোন কালে একা হয় নিক' জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী ।'

মাতৃময়ী কল্যাণময়ী নারী স্নেহে, প্রেমে, দয়া মায়ায় লালন পালন করে 'শিশু পুরুষেরে'- কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে কি পায় ? উপেক্ষা, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। এই বঞ্চনার উদাহরণ দিতে নজরুল টেনেছেন পুরাণের ঘটনা পুরাণের কাহিনী । বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জন্মদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র পরশুরামকে। পিতার আদেশে তিনি জননীকে কুঠার হেনেছিলেন, অথচ তিনি পূজনীয় দেবতা ।

'তিনি নর অবতার
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার!'[৫]

নজরুল স্মরণ করেন শিব-দূর্গার একক মূর্তি 'অর্ধনারীশ্বর' কে যার অর্ধেক নারী অর্ধেক নর।

'পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর
নারী চাপা ছিল এত দিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর।'[৬]

নারীর কাজের স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরে থাক, তাকে নানা কায়দা কৌশলে কোণঠাসা করে নর হরণ করেছ স্বাধীনতা, বঞ্চিত করেছে মৌলিক অধিকার থেকে । পুরুষের এই জুলুম নজরুলের মনে নারীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে অপার বেদনা। তিনি বেদনার সাথে প্রত্যক্ষ করেছেন-

'খোদার দুনিয়ার পুরুষ আজ জালিম নারী আজ মজলুম ।'

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অত্যচারীদের স্মারণ করিয়ে দেন -

'যুগের ধর্ম এই -
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই'।[৭]

প্রচন্ড ক্ষোভে নজরুল উচ্চারণ করেন,

'সে যুগ হয়েছে বাসি
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না'ক, নারীরা আছিল দাসী'[৮]

কবি শুনতে পাচ্ছেন নব জাগরণের সুর, বেজে উঠেছে পরিবর্তনের ডঙ্কা. কেউ আর কারো অধীনে থাকবে না, কেউ হবে না কারো নিপীড়নের শিকার । পুরুষ যদি নারীকে বন্দী করে রাখে তবে -

'নর যদি রাখে নারীরে বন্দী তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে'।[৯]

এ যেন নিউটন'স থার্ড ল অব মোশন 'টু এভরি এ্যাকশন দেয়ার ইজ এন ইকুয়াল এ্যান্ড অপজিট রিএ্যাকশন'।

পরশ পাথরের ছোয়ার যেমন সব কিছু স্বর্ণ হয়ে যায় তেমনি নারীর অঙ্গ ছুঁয়ে ধাতব পদার্থ স্বর্ণ রৌপ্য অলংকারে পরিনত হয়। 'নারী' কবিতায় নজরুল যদিও নারীর সৃজনশীলতা বুঝাতে বলেছেন -

'স্বর্ণ রৌপ্যভার -
নারীর অঙ্গ পরশ লভিয়া হয়েছে অলংকার।'[১০]

কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন সাজ-সজ্জার নামে অলংকারের ভারে নুব্জ্য নারী 'স্বর্ণ রৌপ্য অলংকারের যক্ষপুরীতে' বন্দী। তাকে ঐ দাসীর চিহ্ন দূর করে যক্ষপুরী থেকে বের হয় আসতে হবে। অবরোধ আবদ্ধ নারীকে তার ভীরুতা কাটানোর জন্য, পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম-অধিকারের মৌলিক দাবী নিয়ে নির্ভয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য কবির উদাত্ত আহবান -

'মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ওশিকল
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।'[১১]

Dhaka University Institutional Repository

একদা নারী 'ছিল ধরার দুলালী মেয়ে' গিরিদরী বনে শাখী সনে গান গেয়ে মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করত। কিন্তু এক সময় গ্রীক রোমান পুরাণের পাতাল অধিপতি 'প্লুটো'র মতই ভারতীয় সমাজ তান্ত্রিক পুরুষেরা অন্তঃপুর নামক পাতাল পুরীতে নির্বসিত করেছেন নারীকে। নজরুল মনে করেন নম্রতা, সৌন্দর্য এবং আলোর প্রতীক নারীকে বিবর বন্দী করলে পৃথিবীতে সত্যি বিভাবরীর আঁধার নেমে আসবে। কবি যমপুরীর মত অন্তঃ পুরের আগল ভেঙ্গে নারী সমাজকে সবলে বেরিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। নাগিনীর মত পাতাল ফুঁড়ে বের হয়ে আসতে আবেগ আকুল হয়ে ডাকদিয়েছেন নজরুল। এজন্য নারীকে কাঠোর হতে হবে, যে হাতে এতদিন সে অমৃত বিলিয়েছে সে হাতে প্রয়োজনে গরল দিতে হবে। নারী সমাজ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং নির্ভয় হতে পরে তবেই-

'সেদিন সুদূর নয় -
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর ও জয়।'[১২]

এভাবেই সংবেদনশীল কবি তাঁর হৃদয়জাত সহমর্মিতায় নারীকে শোনান আত্ম প্রত্যয়ী আশাবাদ, উদ্বুদ্ধ করেন নিজের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হতে।

মূলত 'নারী' কবিতায় কবির প্রত্যয়ী মনোভাব, সত্য প্রিয়তা ও মানবতাবোধ কবিকে নারীর প্রতি সমব্যর্থী এবং মর্যাদা সচেতন করে তুলেছে। বিশ্বাসও আবেগের নির্ভর তাঁর এই অনুভব ছিল খুবই তীব্রও আন্তরিক। নারীর স্বাধিকার ও মর্যাদার প্রসঙ্গটিকে পূর্ণ ও পরিনত রূপে তুলেধরেছেন। নির্যাতিত মানুষের বেদনার সাথে নারীর বেদনাকে এক করে দেখেছেন তাই নারীর স্বপক্ষে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আসলে কবি নজরুলের মানবিকতা বোধেরই বহিঃ প্রকাশ।

অগ্নি শিখার প্রচন্ড শক্তিমত্তায় নারীত্বের ব্যাপক জাগরণের আহবান ধ্বনিত হয়েছে নজরুলের অজস্র গানে। মানুষের নির্মিত অবরোধের কারাগারে অত্যাচার, পরাধীনতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতার চক্রান্ত নসাৎ করে নারীকে স্বমর্যাদায় এবং স্ব মহিমায় প্রকাশিত হবার জন্য কবি তাকে জোরালো দৃপ্ত ভাষায় উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন।

'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা।'[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

কবি অবরোধের দূর্গে আটক নারীদের দুর্নীতির অবসান কামনা করেছেন। নারীর সম-অধিকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি হাতড়ে ফিরেছেন ইতিহাস, ঐতিহ্য, মিথ, ধর্ম । ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, উচ্চনীচের ভেদহীনতা, আমির ফকিরের শ্রেণীহীনতা সর্বোপরি মুসলমান বর্হিভূত বিশ্ব মানবের পারস্পরিক মর্যাদাসম্পন্ন সমঅধিকার যুক্ত পরিচিতির কথা ব্যক্ত করার পাশাপাশি ইসলামের মর্ম বাণীর আলোকে নারীর 'নর সম অধিকারের' দীপ্ত উচ্চারণ ধ্বনিত করেছেন।

'নারীর প্রথম দিয়াছি মুক্ত নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া করিয়াছি একাকার।'[১৪]

মুসলমান সমাজকে স্মারণ করিয়ে দিয়েছেন ইসলাম ধর্ম প্রথম নারীকে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্ত করে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ 'বিষেরবাঁশী' (১৯২৪)। এই গ্রন্থখানা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'বাঙলার অগ্নি নাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলাকুল গৌরব আমার জগজ্জননী স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে'। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এই উৎসর্গের কারণ হলেও মিসেস এম. রহমানের তেজস্বিনী চরিত্র যে ঐ গ্রন্থ উৎসর্গে নজরুলকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই । এই দৃঢ়চেতা মহান মহিলার কাছ থেকে সব সময় নজরুল পেতেন দৃঢ় সমর্থন, প্রেরণা ও স্নেহময় আশ্রয়। তাঁর মৃত্যুতে কবি শোকাকুল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন 'মিসেস এম. রহমান' নামের শোক কবিতায় । কবিতার প্রথমাংশে আছে সেই দুঃখজাত তীব্র বেদনার বিবরণ, আছে মাতৃহারা সন্তানের কাতর ক্রন্দন। পরবর্তী অংশ মিসেস রহমান সম্পর্কে কবির অশ্রুসিক্ত স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতি চারণের মাধ্যমে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে মিসেস রহমানের দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বাধীন চেতনা ও প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা । মিসেস এম. রহমান ছিলেন বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার আর্দশের অনুসারী। নারীর অপমান জনক অবরোধ এবং 'বন্ধন বাধ' এর বিরুদ্ধে তাঁর ছিল সাহসী অবস্থান। তিনি ছিলেন স্বাধীনতাকামী মুক্ত মনের অধিকারী আর সে কারনেই নজরুল তাকে অভিহিত করেছেন 'আরব বেদুইনদের পথ ভুলে আসা মেয়ে বলে' হেরেমের উঁচু

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীর যাকে আহত করতো, যিনি ছিলেন মুক্ত আলো বায়ুর প্রত্যাশী। নজরুল তাঁর কবিতায় জানান মিসেস রহমান নারীদের 'হেরেম মহলে' বন্দীকরে রাখার বিপক্ষে, তাঁর মতে ঐ হেরেম আসলে বাঁদী খানারই মোহময় ছদ্মনাম। বাংলার এই অগ্নি কন্যা মুসলিম মহিলা কুল গৌরব মিসেস রহমান-

'আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য কালের নারী
করিছে পুরুষ জেল দারোগার কামনার তাবেদারী!
বলে না কোরান, বলে হাদিস,ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস
হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী।
মানে নাক'তারা কোরানের বানী সমান নর ও নারী!'[১৬]

মিসেস এম রহমান জানতেন সেই সব মোনাফেক সুবিধাবাদি শাস্ত্রবিদদের কথা যারা শাস্ত্র ছেঁকে নিজেদের সুবিধা মত উদ্ধৃতি তুলে এনে হাসিল করে নিজেদের স্বার্থ, গোপন রাখে নারীর মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম স্বীকৃত অধিকার সমূহ । এই মহিয়সী মহিলা বিশ্বাস করতেন-

'শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের মত সুবিধা বাছাই করে
নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ যত চোরে।'[১৭]

'কাঁটা কুঞ্জে সদা উদ্যতফণা নাগমাতা ' এই চিরজীবি মেয়ে পৃথিবীতে না থেকে ও বেঁচে আছেন বন্দিনীদের বেদনার মাঝে, বেঁচে আছেন মুক্তিকামী নিখিল নারী সীমন্তে বিজয়ের জয়টিকা রূপে।

নারী জাগরণে উৎসাহী মিসেস রহমানের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রর্দশনের মাধ্যমে নজরুল এক দিকে যেমন নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তাঁর জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করলেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন নারী মুক্তি কামী পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি।

এছাড়াও নজরুল তার 'চিত্তনামা' উৎসর্গ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহ ধর্মিনী বাসন্তী দেবীর উদ্দেশ্যে। দেশ বন্ধু নজরুলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন তার হিন্দু মুসলমান মিলন প্রয়াসের জন্য। কেননা নজরুলেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনা ছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

'সর্বহারা' উৎসর্গ করেন নজরুল তাঁর মা বিরজা সুন্দরী দেবীর শ্রীচরণারবিন্দে । মায়ের স্নেহে তিনি নজরলকে আদর করতেন । তাঁর অনুরোধেই নজরুল দীর্ঘ অনশন ভেঙ্গে ছিলেন হুগলী জেলে ।[১৮] শুধু তাই নয়- 'ধূমকেতু'র সত্ত্বাধিকারী ছিলেন নজরুল স্বয়ং, পরে অবশ্য এই সত্ত্ব তিনি বিরজা সুন্দরী দেবীর নামে লিখে দিয়েছিলেন।[১৯]

নজরুল তাঁর স্নেহসিক্ত মনের পরিচয় রেখেছেন চট্টগ্রামের স্মৃতি ধন্যকবিতা গ্রন্থ 'সিন্ধু হিন্দোল' বাহার নাহারকে উৎসর্গ করে। 'চোখের চাতক' দিয়েছিলেন কল্যাণীয়া বীণা কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয় যুক্তাসু'কে ।

নারীকে মহিমান্বিত অতুলনীয় এবং অমর করতে কিংবা শ্রদ্ধাজানাতে তিনি তাঁর অবিস্মরনীয় সৃষ্টি সম্ভার নারীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন অভিভাষণে, চিঠি পত্রে নারীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা দেখিয়েছেন । নারীকে আলাদা করে রেখে তার সামনে দেয়াল তুলে অবরোধে রাখার তীব্র বিরোধীতা করেছেন নজরুল। ১৩৪৩ সালে ফরিদ পুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি কঠোর অবরোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারণ করেন-

'ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে সুবেহ সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহ ধর্মিনী নয় সহকর্মিনী হয়ে ছিলেন - যে নারী সর্ব প্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে তাঁর রসুলকে তাকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দূর্গে বন্দিনী করে সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে । তাই আমাদের সকল শুভ কাজ কল্যাণ, উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন।'[২০]

ইসলাম ধর্মে পুরুষের সাথে সাথে নারীকে দেওয়া হয়েছ সমান অধিকার, কিন্তু কাঠ মোল্লারা তা বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে রেখেছে প্রাচীর বন্দী করে । সে সম্বন্ধেও কবি সজাগ- 'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল । আমাদের বাংলাদেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।'[২১]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাহিত্যে নারী এসেছে বহু মাত্রিক অনুসংগে কখন ও শক্তি রূপে , মাতৃরূপে কখনও বা প্রেমিকা রূপে। আবার পৌরাণিক যুগ থেকে ভারতীয় সাহিত্যে নারীর যে রহস্যময়, কুহেলিকাময় অবস্থান - সেটিও এসেছে তাঁর নারী চরিত্র চিত্রনে । কিন্তু নজরুলের নারী ভাবনায় সবচে' যেটা প্রধান্য পেয়েছে তাহলো নারীকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন সকল অধীনতা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্যায় ও অমর্যাদার বিরুদ্ধে এবং নিজস্ব চিন্তায় নারীকে করেছেন অনুপ্রাণিত, করেছেন আলোড়িত । এখানেই নারী ভাবনায় নজরুল প্রগতি শীল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

(১) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড, আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

(২) নজরুল প্রসঙ্গে - ড. রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট-আগষ্ট ১৯৯৮

(৩) নজরুল চরিত্র মানস - ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্কারণ মাঘ-১৩৯৫

(৪) কাজী নজরুল ইসলাম - জীবন ও কবিতা - ড. রফিকুল ইসলাম, মল্লিক ব্রাদার্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৯

(৫) নজরুল প্রভিতা - মোবাশ্বের আলী, মুক্তধারা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৯৫

(৬) নজরুল জীবনী - ড. রফিকুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ-১৯৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কবিতায় নারী

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের বিশাল সাহিত্য কর্মে নারী এসেছে বিচিত্র রূপেবহু অভিধায়। নজরুলের নারী বন্দনা-নারীর মহিমাকেই উদ্ভাসিত করেনি তাঁর সাহিত্য কর্মকেও করেছে ঋদ্ধ।

জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় একজন নারী কখনও স্নেহময়ী জননী কখনও জায়া কখনও বা ভগ্নি, কন্যা। সর্বোপরি নারী প্রিয়া-প্রেমিকার রাজঐশ্বর্যে হৃদয় আসনে অধিষ্টিতা।

নারীর এই বিচিত্র অনুসঙ্গ নজরুল অত্যন্ত নিপূণ ভাবে এঁকেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। সে কারণেই নারী যখন যে রূপে তাঁর সাহিত্যে এসেছে তাকে তিনি তুলে ধরেছেন যথার্থ রূপে।

নজরুল সাহিত্যে জননী এসেছেন ভারতীয় সনাতন আদর্শে, মা সর্বদাই শাশ্বত মাতৃময়ী মমতাময়ী। তিনি সন্তান বৎসল ধর্যে, ক্ষমায় তুলনাহীনা।

জায়া চিরায়ত প্রেমের লাবন্যে উচ্ছল। অন্তঃপুরে থেকে হৃদয় মাধুর্যে সিক্তকরেন পতিকে। সতীত্ব তার কাছে স্বর্গীয় সম্পদ তাই তিনি পতিব্রতা পতিভক্ত।

কিন্তু নারীকে প্রেয়সী রূপে বিচিত্র করতে কবি নজরুল দ্বিধা বিভক্ত। নারীর প্রিয়া রূপকে একদিকে যেমন তিনি পূজা করেছেন আবার ঘৃণাও করেছেন। নারী যখনই প্রেমিকা তখনই তার প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ।

ডঃ আহমদ শরীফ ব্যাপারটিকে এভাবে দেখেছেন 'নারীর প্রসন্ন দৃষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য নারীর চরণ চুম্বন তাঁর কাছে নারী বশ করার একটা প্রয়োগিক উপায় ছিল বটে। কিন্তু প্রণয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিলনা। তাই ক্ষোভে, রোষে, অনুযোগে তিনি নারীকে মনের দিক দিয়ে হেঁয়ালী, কুহেলিকা, মায়াবিনী ও ছলনাময়ী বলে নিন্দাই করেছেন বার বার।'[১]

এই মনোভক্তির একটা মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণও রয়েছে। নজরুলের মানস, চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করে আছে ভারতীয় শাশ্বত মুল্যবোধ। ভারতবর্ষে নারীকে পূজা করা হয় দেবী রূপে - আবার তাকে ব্যবহার করা হয় দাসীর কাজে। নারী একাধারে দেবী এবং দাসী। নারী গৃহ লক্ষ্মী-নারী ঘৃণ্য গনিকাও।

Dhaka University Institutional Repository

দেবীর আসন-ছাড়া এইসব নারীর ভাগ্যে জুটেছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। নারীকে দেখানো হয়েছে অবিশ্বাসী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর রূপে। একারণে তারা হয়েছে নিগৃহীত, শোষিত ও শৃঙ্খলিত। সামাজিক পারিবারিক সব দিক থেকে হয়েছে অমানবিক বৈষম্যের শিকার।

তবে এই সব ধারণার পাশা পাশি নজরুল সাহিত্যে আরো কিছু নারীর সন্ধান আমরা পাই যারা পুরুষ শাসিত সমাজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে অসামান্য দুঃসাহস দেখিয়ে প্রথাগত মূল্যবোধ ও প্রচলিত ধ্যান ধারণা ভেঙ্গে বাইরে এসেছেন। গ্রহণ করেছেন সংগ্রামী জীবন, প্রতিবাদী চেতনায় গড়তে চেয়েছেন সংস্কার মুক্ত সুস্থ সমাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নারীকে নজরুল বিকশিত করতে চেয়েছেন অগ্রগামী চিন্তার ধারক বাহক রূপে। সে কারণে নজরুলের কবিতায় নারী এই আলোচনায় প্রাধান্য পাবে নারী জাগরণে ও প্রেম বোধে আলোরিত কবিতামালা। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'অগ্নিবীণা ' (১৯২২) বারটি অপূর্ব কবিতার সমন্বয়ে এক অমর কাব্য। এই কাব্যে রয়েছে উদ্দীপনাময় প্রাণ মাতানো কবিতা গুচ্ছ।

'অগ্নি বীণার' 'রক্তাম্বর ধারিনী' মা কবিতাটিতে কবি ব্যবহার করেছেন বিশিষ্ট নারী অনুসঙ্গ। এখানে নারী জাগরণ প্রত্যক্ষ ভাবে না এলেও নারী এসেছে শক্তি রূপিনী বা মাতৃদেবতার কল্প চিত্রে। ঐশী শক্তির রূপকে, বিভিন্ন উদ্দীপক উপমায় বিদ্রোহী নারী সত্তার উদ্বোধন দেখানো হয়েছে । কবিতার শুরুতে কবি শ্বেত বসনা দেবীকে আহবান করেছেন--

'রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন ।' [২]

হিন্দু পুরাণের মহাশক্তি রূপিনী চন্ডী। সময়ের প্রয়োজনে তাকে আরো রুদ্রময়ী হতে হবে। সিঁথিতে সিঁদুর নয়- থাকবে 'কাল-চিতা' 'খড়গ-রক্ত' হবে 'স্রষ্টার বুকে লালফিতা' আর

Dhaka University Institutional Repository

এলোকেশে দুলিয়ে আনবে কালবৈশাখী ভীমতুফান। জালিম ও অত্যাচারীকে দমন করতে 'মেখলা' করবে চাবুক।

চন্ডী রূপী মাকে তিনি বলছেন-

'দেখা মা আবার দনুজ দলনী
অশিব নাশিনী চন্ডী রূপ ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ করই-
আনিতে পারে কি বিনাশ স্তুপ ।'[৩]

আমরা লক্ষ্য করেছি নজরুল মানসে যে ধ্বংসের চিন্তা সেটি নিছক ধ্বংস নয়- ধ্বংস নব সৃষ্টির জন্য । এ কবিতাতেও তাই দেবী চন্ডী শুধু অসহায় সমক্ষীণ ক্রন্দনই করবেন না তিনি পোঁজা তুলার মত সব অন্যায় অত্যাচার উড়িয়ে দেবেন। নব সৃষ্টির জন্য ধ্বংস করবেন জীর্ণতা । আর সেই সৃষ্টির মধ্যেই পূর্ণিমার চাঁদের মত জ্বল জ্বল করবে তার কল্যাণী রূপ।

'ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সুষ্টির নব পূর্ণিমা।'

শাশ্বত মাতৃদেবীকেই কবি উঠে আসতে বলেছেন। নব জাগরণও নব মানবিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে । সে মা হবেন বীরত্বে ব্যক্তিত্বে অন্যন্য এক বীরাঙ্গনা । শক্তি রূপিনী 'রক্তাম্বর ধারিণী মা।'

'অগ্নিবীণা'র 'আগমনী' কবিতাটিতেও প্রায় একই সুর বিধৃত।

'আজ রণ রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ মহারণ
দশদিক তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ব বাসীকে
শাশ্বত নহে দাবন শক্তি পায়ে পিষে যায় শির পশুর!'[৫]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল তাঁর কাব্য সাধনার অর্ন্তলোকে এ সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচার অপনোদিত করতে হলে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের কোন বিকল্প নেই। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি নারীদের সাহসিকা হতে বলেছেন, বিদ্রোহিনী হতে বলেছেন।

যুগ ধর্ম অনুসারে নজরুল এমন একজন কবি যাঁর মধ্যে বিপ্লব ও ভালোবাসা যুগপৎ প্রধান দুই ধারা। আবেগে নজরুল পূর্ণ রোমান্টিক। 'অগ্নিবীণা' থেকে 'প্রলয় শিখা' পর্যন্ত কবিতার মূলরস বীররস হলেও এর সংগেই অঙ্গীরস হিসেবে আমরা পাই শৃঙ্গার ও শান্তরস। 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়া নট', 'পূবের হাওয়া' তার নিদর্শন।[৬] নজরুল কাব্যে যৌবনের দুটো দিক বিদ্রোহ ও প্রেম। দুটি স্ববিরোধী নয় একে অন্যের পরিপূরক। উদ্দীপনা মূলক কবিতায় তিনি একেবারে আনকোড়া-নতুন, কিন্তু প্রেমের কবিতায় ধরা বাঁধা পথেই চলেছেন। চললেও তাঁর প্রেমের কবিতা অন্যান্য কবির প্রেমের কবিতা হতে আলাদা একটু যেন স্বতন্ত্র। দেহগত আবেগকে তিনি কবিতায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। অমানবীর সাথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেননি। রক্তে মাংশে গড়া মানবীর সাথেই তাঁর প্রেম।

কাজী নজরল ইসলামের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'দোলন-চাঁপা' (১৯২৩)। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রেমের সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম হৃদয় অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে 'পূজারিণী', 'চৈতী' হাওয়া তার মধ্যে অন্যতম।

সুদীর্ঘ কবিতা 'পূজারিণী'। প্রেম সম্পর্কিত সব ধারনাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। তবে 'পূজারিণী' প্রেমের কবিতা হলেও বেশ কিছু পংক্তিতে ব্যর্থ প্রেমিকের অন্তরজ্বালা এবং প্রেমিক সত্তার প্রবল আবেগে নারী সম্পর্কে কয়েকটি ক্ষোভ পংক্তিও সংযোজিত হয়েছে। 'পূজারিণী' নজরুলের জীবন্ত মানস প্রতিমা।[৮] এখানে নজরুল স্বয়ং পূজারিণী, প্রেমিকা দেবতা। পূজারিণী তার মানস প্রতিমার পবিত্র মূর্তি এঁকেছেন। সে দেবী, চির শুদ্ধা তাপস কুমারী, সে চির পূজারিণী। সুফি সাধকরা যেমন করে ঈশ্বরের নাম জপ করে সরাসরি ঈশ্বরকে পেতে বা কাছে যেতে চান, নজরুলও সে ভাবে প্রিয়াকে ইষ্ট নাম জপ করে পেতে চেয়েছেন। 'ইষ্টমম জপমালা ঐতব সবচেয়ে মিষ্টি নাম ধরে।'[৮]

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতির ভাবে নূয়ে পড়া প্রেমিক তার চেতনায়-

'মনে পড়ে - বসন্তের শেষে - আসা ম্লান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি,
যে দিন আমার আঁখি ধন্য হলো তব আঁখি চাওয়া সনে মিশি।'[৯]

কিন্তু সেই স্মৃতি সুখের হয়নি। হয়েছে বিষাদের, বিরহের। অভিমানী প্রেমিকের গাঢ়-ঘন-বেদনার- জৈবিক প্রকাশ এখানে ঝুরে ঝুরে পড়েছে।

'সেই পূণ্য গোমতীর কুলে-
প্রথম উঠিল কাঁদি' অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম মূলে।'[১০]

প্রেমের জ্বালা আবেগ শুধু নিজের মধ্যেই আবদ্ধ নেই ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতিতেও-

'খুঁজে ফিরি, কোথা হ'তে এই ব্যথা-ভরাতুর মদ-গন্ধ আসে-
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু - মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘ শ্বাসে।'[১১]

এই কবিতায় নজরুল প্রেমিকা সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তাও উল্লেখ করার মত। বিজয়িনী, পূজারিণী, অভিমানী আবেগের আতিশয্যে তা ভিখারিণী হয়েছে। প্রেমিকাকে নিয়ে তাঁর আবেগ এতটাই বেশি যে বিশেষ কোন নামে ডেকে তৃপ্তি হচ্ছে না। পুরাণ থেকে পদাবলী থেকে নাম বেছে নিয়েছেন রাধা, সীতা, উমা, তাপস বালিকা। শুধু প্রাচীন নায়িকারাই নয় প্রতি নায়িকা ললিতার নিভৃতে অতি অন্তরালে কান্না, দয়মন্তী, তাপস বালিকা শকুন্তলার কান্না সব মিলিয়ে এক বিষন্ন হৃদয় হাহাকার করা অবস্থা। গোমতীর কুলে ছোট্ট কুটিরে প্রেমের প্রথম অনুভবকে তিনি কিংবদন্তীর প্রেমের সাথে মিশিয়ে যেন একাকার করে দিয়েছেন। বর্তমান বিরহের মধ্যে অতীত বিরহের সামঞ্জস্য এনেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু যে ভাবে প্রেমের সন্ধানে মহা ভিক্ষায় বের হন, কবিও তেমনি উপবাসীর মত দ্বার হতে দ্বারে প্রিয়াকে খুঁজে চলেছেন। কিন্তু যাকে তিনি চেয়েছেন তাকে তিনি পাননি। সে কারণেই প্রেম সম্পর্কে তিনি সন্দিহান, হতাশ। ক্ষোভে, রোষে, অনুরাগে তিনি নারীকে শেষ পর্যন্ত মনের দিক দিয়ে হেঁয়ালী, কুহেলিকা, মায়াবিনী ও ছলনাময়ী বলেছেন।

'এ তুমি আজ সে তুমি তো নহ:
আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন-

'যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্ঠা ভগবানে
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে।'[১৩]

এখানেই নজরুলের প্রেমের কবিতার ট্রাজেডি। যে প্রিয়া তাঁকে নিয়ে অকরুণ খেলা খেললো যে মহাদান তিনি দিতে চাইলেন তা-ও গৃহিত হলো না। তখন মনের সমস্ত ঘৃণা ঢেলে উচ্চারণ করতে বাধ্য হলেন-

'এরা দেবী, এরা লোভী; যত পূজা পায়-
এরা চায় আরো-'

শুধু একজনের হয়ে এরা থাকতে চায় না। হতে চায় বহু জনের '

ইহাদের অতি লোভী মন-
একমনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয় যাচে বহুজন।'[১৪]

নারী সম্পর্কিত নজরুলের এই উক্তি আমাদের বিচলিত করে। হয়তো এটা ব্যর্থ প্রেমিক নজরুলের উক্তি। কেন না নজরুলের মত আর কোন কবিই এত বেশি নারী বন্দনা করেননি। নজরুল নারীকে পূজা করেছেন, নারীর সঙ্গ কামনা করেছেন, নারী দেহকে মনে করেছেন পবিত্র মন্দির। যেখানে এক দেবতা এক পূজারীর উপসনাগার। সে কারণেই হয়তো এই 'পূজারিনী' কবিতাতেই আমরা দেখতে পাই - অতৃপ্ত প্রেমিক-প্রেমিকার শত উপেক্ষা সত্ত্বেও সেই পাষাণ প্রিয়ার প্রেমের রাজ্যে বিরাজ করতে আগ্রহী। প্রাণের শেষ চাওয়া, দিয়ে বিশ্ববিদ্রোহীর নৈবেদ্য দিয়ে নারীর প্রেমই তিনি কামনা করেছেন এবং মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চেয়েছেন।

'মরিয়াছে অশান্ত অতৃপ্ত চির স্বার্থপর, লোভী,-
অমর হইয়া আছে-রবে চির দিন
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি।'[১৫]

নজরুল সাহিত্যে আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করি তিনি সর্বদা নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। নারীকে অবরোধ মুক্ত করতে, মানবিক অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং অধিকারহীন বঞ্চিত জীবন থেকে আলোকিত পথে আনতে বেগম রোকেয়ার মত নজরুলের চেষ্টাও ছিল

Dhaka University Institutional Repository

অন্তহীন। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত নারীর জন্য তাঁর বেদনা অপার, হৃদয় স্পর্শী। প্রেমের ক্ষেত্রেও তিনি সজীব, প্রেমের ব্যর্থতা তাঁকে স্থবির করেনি। করেছে চলমান। 'ওয়ার এ্যান্ডপিস' উপন্যাসের নায়িকা নাতাশার মত তাঁর ভাল বাসাও বয়ে গেছে বহতা নদীর মত। কূল ছুঁয়ে উর্বর করেছে নদীতট নিজের এবং নারীর জীবনকে করেছে ঋদ্ধ। নারীকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শুনি-

'তুমি আমায় ভালবাস তাইতো আমি কবি
আমার এরূপ - সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।'[১৬]

নজরুল নার্গিসের প্রেম এত বিতর্কিত, এত আলোচিত সেই প্রেম সম্বন্ধে নজরুল কি বলেন? হিংসাতুর প্রেমিকাকে হিংসা নয় বরং উদারতায় কবি মহৎ করে দিলেন। নার্গিস আসার খানমকে নজরুল লিখেছিলেন 'তুমি এই আগুনের পরশ মানিক না দিলে আমি অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না।'

অবশ্য মুজফফর আহমদের মতে 'এই বিবৃতিতে কিঞ্চিত বাড়াবাড়ি আছে। অগ্নি-বীণার অনেক কবিতাই ১৯২০ সালে লেখা। অগ্নি-বীণা বাজাবার শক্তি তো নজরুলের ভিতরেই ছিল।'[১৭]

ছিল যে, সে কথা তো সবাই জানেন কিন্তু কত বড় মহৎ প্রানের অধিকারী হলে জীবনের পরম বেদনা বিধুর নায়িকাকে ক্ষমা করা যায় সেটা উপলব্ধি করেন কয় জনে? নারীর প্রতি অসীম সহনশীলতা অপরিমেয় ঔদার্য থাকাতেই নজরুল তা করতে পেরেছিলেন। কেবল বিরহের নায়িকার উদ্দেশ্যেই তিনি কবিতা রচনা করেন নি। মিলনের নায়িকা, জীবন সংগিনী প্রমীলাকে নিয়েও লিখেছেন,

'আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।।'[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর নিরাভরণ, ধ্যানী এবং ত্যাগী রূপ নজরুলকে মুগ্ধ করেছে- করেছে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রবণ।

'তুমি মলিন বেসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায় ।
তুমি আমার তরে ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়,
....
দেবী! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারিকে ভালবেসে সাজলে ভিখারিনী!'[১৯]

'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় নজরুল বলেছেন যে, 'যা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে' রাজ সরকার নিয়ে নেন। অর্থাৎ তাঁর কাব্য বের হলেই বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল 'বিষের বাঁশী' ও। আসলে 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) 'অগ্নি-বীণা' দ্বিতীয় খন্ড নামে প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কেন না 'অগ্নি-বীণা'র মূল সুরই এখানে প্রতিধ্বণিত হয়েছে। যা হোক তিনি 'বিষের বাঁশী' কাব্য খানা উৎসর্গ করেন 'বাঙলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলাকুল গৌরব আমার জগজ্জননী স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার চরণারবিন্দে।'

হয়তো ব্যক্তিগত সম্পর্ক এই উৎসর্গের কারণ হতেও পারে।[২০] তবে তেজস্বিনী এই মহিলা তাঁর মতাদর্শ দিয়ে গোঁড়া সমাজের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করে নজরুলের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। 'চানাচুর' (প্রবন্ধ), 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের রচিয়তাকে নজরুল 'নাগ-মাতা' সম্বোধনে লিখলেন-

'ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল!
ধূমকেত-ধূম-গহবরে যত সাগ্নিক শিশু ফণী
উল্লাসে ''জয় জয় নাগমাতা '' হাকিল জয়-ধ্বনি! '[২১]

নজরুলের জগণ্মাতা মিসেস এম. রহমান পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন- তাঁর মৃত্যুতে নজরুল 'মিসেস্ এম. রহমান' নামে যে কবিতা লেখেন তাতে সে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তনে মিসেস এম. রহমানের বলিষ্ঠ ভুমিকাও তাঁর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধার কারণ । নজরুল লিখেছেন-

'সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে
সে বলিত, ''ঐ হেরেম মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদি-খানা ঐ হেরেমের মোহে!
নারীদের এই বাঁদি করে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু প্রবৃত্তি হীন অপমান বাজে।
বলে না কোরান, বলেনা হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস।
হাদিস কোরাণ ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী
মানে না ক তারা কোরানের বাণী - সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে
নারীদের বেলা গুম্ হয়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে।''[২২]

দেখা যাচ্ছে নজরুলের যে দৃষ্টি ভঙ্গি নারীদের সম্বন্ধে তার সাথে মিসেস এম. রহমানের বক্তব্যের প্রচন্ড মিল ।

নজরুল মিসেস এম. রহমানের যে চরিত্র পূজা করেছেন তাতে নারী জাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।[২৩] নজরুল তাঁর নাগ-মাতা সম্বন্ধে লিখেছেন-

'কাঁটা কুঞ্জে ছিলে নাগ-মাতা সদা উদ্যত-ফণা
আঘাত করিতে আসিয়া "আঘাত' করিয়াছে বন্দনা।'[২৪]

এখন দেখা যাক "অগ্নি-বীণার' সাদৃশ্য ধ্বনি এই কাব্যের কবিতায় কি ভাবে ধরা পড়েছে। অগ্নি-বীণার 'রক্তাম্বর ধারিনী মা' কবিতায় আমরা দেখেছি হিন্দু পুরাণের মহাশক্তির চন্ডীরূপকে কবি আহবান জানিয়েছেন জালিম ও অত্যাচারীকে শক্ত হাতে দমন করতে। যে দেবীর সিঁথিতে সিঁদুর নয় শোভা পাবে কালচিতা যার এলো কেশ হবে ঝঞ্ঝা ও কাল বৈশাখীর প্রতীক। 'বিষের বাঁশী' র 'জাগৃহি' কবিতাও অনেকটা 'রক্তাম্বর ধারিনী মা' র চেতনা সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা এই দেবী মাতা ও স্বাধীকার এবং সংগ্রামের প্রতীক- 'চন্ডী-চামুন্ডা-মা সর্বনাশী' কাল বৈশাখী সন্ধার সংগে রন-উন্মাদিনীর মত নেচে চলেন তিনিও। তার গলাতেও শোভা পায় নরমুন্ড মালা। এ কবিতায় কবি নবজাগরণ, নব চেতনার মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেবীকে উঠে আসতে বলেছেন বীরাঙ্গনার মূর্তিতে। 'ধ্বংসের বুকে' যিনি হাসাবেন 'সৃষ্টির নব পূর্ণিমা'। তিনিই হবেন শক্তিরূপিনী রক্তাম্বর ধারিণী মা। 'জাগৃহি' কবিতাতে দেবীর সংহারক মুর্তির পাশাপাশি তাকে আহবান করেছেন কল্যাণময়ী নারী রূপে।

'দেহ ক্ষান্ত রণে, ফেল রঙ্গিনী বেশ,
খোলো রক্তাম্বর মাতা সম্বর কেশ!
এতো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা!
আজ জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা!

জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!
আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি!

নিয়া মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ
এলো শক্তিস্বাহা, বাজে শাঁখ জ্বালে ধূপ।'[২৫]

এখানে দেবী চন্ডী, দেবী দূর্গার আড়ালে কবি নারী শক্তি, তার কল্যাণকর চেতনারই আহবান করেছেন। 'তূর্য নিনাদ' এ বলেছেন-

'দশভূজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশ প্রহরণ-ধারিনী মা'র
হাঁকিছে নকীব,- আবিরা বির্মএধি হে নব যুগাবতার? '[২৬]

'বড়দিন' কবিতায় 'মদ খেয়ে বদ হইয়া বাঙালির মেয়ে ধরে', এ সংবাদ কবিকে এত মর্মাহত করে যে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের সর্বকালের ঘৃণ্য 'ইহারা কলঙ্ক ব্রিটিশের' বলে তীব্র প্রতি বাদ করেন। আর এদেশবাসীকে মনে করেন-

'ঝোপের ইঁদুর,বেজি,
ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর সেও কত বেশি তেজি।।'

নারীকে সাহসিকতা বিপ্লবী হতে ডাক দিয়েছেন-তার কল্যাণী রুপ নিয়েই।

Dhaka University Institutional Repository

'আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তেমার শঙ্খ, নারী!
ঐ দ্বারে মা'র মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠছে তারি।'[২৭]

১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের আর একখানা নিষিদ্ধগ্রন্থ 'ভাঙার গান'। সেখানে 'মোহান্তের মোহ অন্তের গান' রচনায় কবির দরদী প্রাণ কেঁদে উঠেছে অসহায় নারীদের জন্য। নারী মন্দিরে, তীর্থে কোন স্থানেই নিরাপদ নয় - তার সতীত্ব লুঠতে পূজারীও বাদ যায়না- 'খোদার খাসি' পূজারী-

মোহের যার নাই ক' অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা-বোনে সর্বস্বান্ত করেছে বেদী মূলে।

দিতে যায় পূজা-আরতি
সতীত্ব হারায় সতী।'[২৮]

'শহীদি ঈদ' কবিতায় কবির প্রার্থনা সমাজে কোরবাণী নিয়ে যত ফাঁকি বাজী, ফেরেববাজীই হোক না কেন- 'মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।'

১৯২৫ সালে বের হয় 'ছায়ানট'। ছায়ানটের প্রথম কবিতা 'বিজয়িনী'। এতে নারীর কাছে প্রেমিক কবির নিঃশর্ত আত্মসমর্পন আমাদের মোহিত করে-

'হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।'

এ কবিতাটি প্রমীলার কাছে নজরুলের আত্মনিবেদনের, নিজেকে সমর্পনের নির্ভুল দলিল।[৩০]

'চিরন্তনী প্রিয়া' তেও প্রেমিক তুষ্ট এই ভেবে যে-

'গরবিনী! গর্বকরে এই কপালে লিখলে জয়ের টিকা,
চঞ্চল এই বাঁধন-হারায় বাঁধতে পারে এক এ সাহসিকতা।'

যুদ্ধফেরত কবি এভাবেই চিরন্তনী প্রেম প্রতিমার কাছে ধরা দিয়ে শান্তি লাভ করতে চান। নয়ন জলে ভেসে প্রেম সাধনায় জয়ী হতে চান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের সূক্ষাতি সূক্ষ্ম অনুভব-হৃদয়াবেগের বিচিত্র অনুভব 'পূজারিনী' কবিতার মত ছায়া ফেলেছে 'ছায়ানট' কাব্যের 'চৈতী হাওয়া'-তে। যে প্রেমিকা হারিয়ে গেছে অন্ধকারে তার বিরহ বিচ্ছেদে কবি মর্মাহত - বেদনা বিধুর। সমস্ত কবিতাজুড়ে বিরহাশ্রু যেন ঝুরে ঝুরে পড়ছে-

'হারিয়ে গেছ অন্ধকারে-পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাপার!'[৩১]

স্মৃতির ভারে নুয়ে পড়া বেদনা বিধুর কবি প্রেমের ক্ষেত্রে হতাশ নয়-যদিও 'তরী আমার কোন কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল'- তবু তার আশা-

'পর পারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',-

এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পরপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'!!' [৩২]

প্রচলিত কথায় আছে আগে 'দর্শনদারী পরে গুনবিচারী'। সত্যেন্দ্রনাথ ও লিখেছেন-

'চোখের দাবী মিটলে পরে তখন খোঁজে মন-
তাইতো প্রভূ সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।'

নজরুল ও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর নায়িকারও দৈহিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়- 'মানস-বধূ' 'প্রিয়ার-রূপ' কবিতায় কবি প্রিয়ারূপী নারীর রূপ বর্ণনায় পঞ্চ মুখ -

'যেমন ছাঁচি পানের কচি পাতা প্রজা পতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন আকুল একটি চুমায় অমনি নোয়ায়।'[৩৩]

'প্রিয়ার রূপ'-এ নারী অঙ্গ, তার অঙ্গ সৌষ্ঠবে কবি মুগ্ধ

'অধর - নিস্‌পিস্‌
নধর - কিস্‌মিস্‌
রাতুল তুল তুল কপোল
নাসায় তিলফুল
হাসায় বিলকুল
নয়ান ছলছল উদাস, '[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

'আমারই বধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া'- শুধু মধ্য যুগের কেন- কোন যুগের প্রেমিকের পক্ষেই এটা সহ্য করা সম্ভব নয়। নজরুল ও পারেননি। তাই 'আল্‌তা স্মৃতি' কবিতায় স্পষ্টভাবেই বলছেন- 'জানি, তোমার নারীর মনে নিত্য নূতন পাওয়ার পিয়াস'- সেজন্যই নূতন রাজায় বরলে আনি'- আর 'মর্মমূলে হানলে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ন ছুরি।'

'জানি রানী, এমনি করে আমার বুকের রক্ত ধারায়-
আমরাই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আল্‌তা পরায়।'[৩৫]

অভিমানী কবির হৃদয় নিংড়ানো বেদনার্তি সহৃদয় পাঠককে বিসন্ন করে তোলে- যখন কবি বলেন-

'আমার মরণ দিয়ে তোমার সখার হৃদয় হ'রেছিলে-
আল্‌তা যেদিন প'রে ছিলে'।। [৩৬]

প্রেমের দেবতা অতৃপ্ত-নজরুলও অতৃপ্ত। মিলনের চেয়ে বিরহ তাঁর কাম্য। এই বিরহজ্বালা-বেদনা দহন তিনি লালন করে সুখ পান- এ যেন তাঁর বেদনা বিলাস। অনেক কবিতায় প্রণয় বিহবল কবির প্রতিদান না পাওয়ার দাহ, তাঁর এক অসহ্য আবেগ, এক অকরুণ ক্ষোভ ও অহেতুক বেদনায় আত্মনিপীড়নের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

নজরুল ইসলাম তাঁর 'চিত্ত-নামা' গ্রন্থটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহ ধর্মিনী বাসন্তী দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। হিন্দু- মুসলমানের মিলনকামী চিত্তরঞ্জন দাসকে শ্রদ্ধা করতেন নজরুল-কেননা নজরুল ও ছিলেন সাম্যবাদী। সেই শ্রদ্ধা বোধেই তাঁর স্ত্রীকে মাতৃস্নেহ কাঙাল নজরুল কাব্যখানা উৎসর্গ করে মায়ের প্রতি তাঁর নিগুঢ় ভক্তি প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু 'পূবের হাওয়ায়' কবির মন আবার উতল- আবার সন্দেহ - মান-অভিমান। প্রিয়াকে 'কলঙ্কিনী' বলতেও বাঁধেনি তার।

'হায় হারানো লক্ষ্মী আমার পথ ভূলেছ ব'লে
চির সাথী যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চলে?

Dhaka University Institutional Repository

বারে বারে নানা রূপে ছলতে আমায় শেষে
কলঙ্কিনী! হাতছানি দাও সকল পথে এসে
কুটিল হাসি হেসে?' [৩৭]

বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম কবি যিনি সাম্যবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন। 'লাঙ্গল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুল বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'। মুজফফর আহমদ লিখেছেন 'নানা উপশিরোনামে বিভক্ত এটি একটি বিরাট কবিতা। 'ঈশ্বর' 'মানুষ' 'পাপ' 'বারাঙ্গনা' 'নারী' ও 'কুলিমজুর' এই কবিতার উপশিরোনাম (সব্-হেডিং) মাত্র। অনেকে ভূল করে এই সব্-হেডিং গুলিকে আলাদা আলাদা কবিতা মনে করেন।' [৩৮] সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথা মূলক গ্রন্থ 'যাত্রী' তে লিখেছেন 'লাঙলে' বের হলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। এক দিনের মধ্যে লাঙল সব বিক্রী হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হলো। নজরুলের কবিতাই ছিল লাঙলের প্রধান আকর্ষণ।'

'সাম্যবাদী' কাব্যে নজরুল গেয়েছেন সাম্যের গান নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্চিত, মানুষের পক্ষ নিয়ে। অপরিসীম উদারতায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'।এই মহানুভবতায় তিনি বারাঙ্গনাকেও মা বলে ডাকতে দ্বিধা করেন নি। নারী পেয়েছে তাঁর সর্বোত্তম সহানুভূতি।

'বারাঙ্গনা' কবিতায় পতিত নারীর জন্য তিনি যে মমত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। হয়তো বা তিনিই প্রথম কবি যিনি বারাঙ্গনাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। 'মাতা-ভগনীর জাতি' বলে সম্মান দিয়েছেন। তার গর্ভের সন্তানকে 'জারজ' বলে ঘৃণা করেন নি বরং ' জ্ঞাতি' বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এজন্য কবিকে কম কথা শুনতে হয়নি। সমাজ তাঁকে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্য থেকে একচুলও সরেন নি। তাঁর সোজা সাপটা জবাব 'দেবতা করলে লীলা খেলা' আর অসহায় নারীর স্খলন হলে হয় অপকর্ম, তা মেনে নেওয়া যায় না। যেখানে 'তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল' সেখানে মলিন ধূলার সন্তান যাদের 'বড় দুর্বল মন' তাদের এত পাপবোধ কেন? জ্ঞান পাপীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়ে দেবার জন্য কবি পুরাণ বর্ণিত মহৎ জারজ চরিত্রের উদাহরণ টেনেছেন। এদের মধ্যে স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী পুত্র মহাবীর ও রণ-গুরু দ্রোনাচার্য জবালা-পুত্র মুনি সত্যকাম এবং মেরীর পুত্র ঈশা। যাদের খ্যাতি যশ-মান-সাধনা দেবতার তুল্য যাদের সাধনা 'সদর স্বর্গ দ্বারে' হানা দেবার স্পর্ধা রাখে। কবি বিশ্বাস করেন 'জনমের পর মানব জাতির থাকে নাক' কোন গ্লানি।' তাই 'জারজ কামজ-সন্তানে দেখি কোন সে ভেদাভেদ নাই।' কবি যুক্তি পেশ করেই বারাঙ্গনা নারীকে বলেছেন-

'অহল্যাযদি মুক্তি লভে মা, মেরী হতে পারে দেবী;
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি ?'[৩৯]

'সেরেফ পশুর ক্ষুধা ' নিয়ে যদি নরনারীর মিলনে সন্তান জন্ম নেয়-তার দায়ভার কেন নারীকেই বহন করতে হবে? কবির উপলব্ধি-

- 'অসতী মায়ের পুত্র যদি জারজ পুত্র হয়-
  অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।'[৪০]

নজরুল বিশ্বাস করতেন নর-নারী পাপ পূণ্যের সমান অংশীদার। বারাঙ্গনা কে সমমর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাকে হেয় করতে তিনি এ কবিতা লেখেন নি।

যে কবিতার প্রায় প্রতিটি পংক্তিই কিংবদন্তীতূল্য সেই বিখ্যাত 'নারী' কবিতায় নারী সম্পর্কে নজরুলের ধ্যান ধারনা, বিশ্বাস, উপদেশ আমাদের মুগ্ধ করে। সকল প্রকার সংস্কারের গন্ডী ভেঙে নারীকে এগিয়ে আসার জন্য এমন আহবান করেছেন যা ধর্মীয় বাণীর মত পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয়। কবির 'চক্ষে পুরুষ-রমণী'র মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন-

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।'[৪১]

নারী পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় ফসল এই সুন্দর বিশ্ব। বিশ্বের তাবৎ সৃষ্টিশীলতার মূল প্রেরণা নারীর কল্যাণ কামনা থেকে। নারী শুভ শক্তির প্রতীক, মঙ্গলময়ী।

Dhaka University Institutional Repository

' জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী,
সুষমা লক্ষ্মী-নারীই ফিরেছে রূপে রূপে সঞ্চারি।'[৪২]

সুষমা লক্ষ্মী নারী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সংসারকে করেছে শান্তির আগার-সচল রেখে বিশ্ব সৃষ্টির অনন্ত ধারা। নারীর বিরহ-মিলন গাথায় তৈরী হয়েছে কতনা উপাখ্যান, নর পেয়েছে কবি প্রাণ। বিনিময়ে নারী কি পেয়েছে? নারী যেন মহান দাতা-দিয়েই এসেছে চিরকাল কিন্তু দাতার মাহত্ব রাখেনি পুরুষ শাসিত সমাজ। কৃতজ্ঞতাটুকু ও প্রকাশ করতে তাদের অণীহা। যুদ্ধকালীন অস্থির পরিস্থিতিতে নারী স্বামী-পুত্র স্বজন হারিয়ে এমনকি সম্ভ্রম হারিয়ে করুণ এবং অসহায় জীবন যাপন করে। আক্ষেপ এখানেই যে বীরের আত্মত্যাগ, বীরের বীরগাথাই ইতিহাসে লেখা থাকে-লেখা থাকে না নারীর অবদান।

'কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?' [৪৩]

শুধু কি তাই? যে পুরুষকে মানুষ করতে নারী 'আধেক হৃদয় ঋণ' দিল- 'শিশু পুরুষে'র শিখালো স্নেহ প্রেম দয়া-মায়া, তার পরিবর্তে নারী পেয়েছে বা এখনও পাচ্ছে অবজ্ঞা-উপেক্ষা লাঞ্ছনা-বঞ্চনা। নারী জীবনের এই বেদনাকে তুলে ধরতে নজরুল পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন - বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জমদগ্নি ও রেনুকার- পঞ্চম পুত্র পরশু রামের প্রসংগ এনে বলেছেন-

'তিনি নর অবতার-
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার।'[৪৪]

কিন্তু এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এর অবসান হওয়া একান্ত দরকার। কবিও প্রবল আশাবাদ নিয়ে উচ্চারণ করেন,

'বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ-আজি,
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও উঠেছে ডঙ্কা বাজি।' [৪৫]

গতির তৃতীয় সূত্র বলে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান প্রতিক্রিয়া আছে। নজরুল পুরুষ শসিত সমাজকে সে কথাই শুনালেন-

'যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।' [৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং নারীকে আর অলংকার পরিয়ে পুতুল সাজিয়ে রাখা চলবে না। যুগের সাথে তাকেও চলতে হবে। নজরুল নারীকেও উদাত্ত আহবান জানিয়ে বললেন, 'দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ'। অলংকারের যক্ষ্মপুরীতে বন্দী নারী চোখ তুলে চাইতে পর্যন্ত ভয় পায়। আড়ালে থেকে ভীরুর মত কথা বলে। এদৃশ্য কবিকে বেদনাহত করে। 'ধরার দুলালী মেয়ে', শাখী-সনে গান গেয়ে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করত সেই আদরিনী আজ আঁধার বিবর-পূরে বন্দিনী। এ প্রসঙ্গে গ্রীক রোমান পুরাণের পাতালাধিপতি 'প্লুটো' যমরাজের সাথে তুলনা করে নজরুল দেখিয়েছেন ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক পুরুষও প্লুটোর মত অন্তঃপুরের পাতাল পুরীতে আদিম বন্ধনে বন্দী করে রেখেছে-আর সেই হতে সেখানে জীবন্মৃত অবস্থায় মরে আছে নারী, 'অর্ধনারীশ্বর'। তাকে চাপা পড়ে থাকলে তো চলবেনা-নাগিনীর মত পাতাল ফুঁড়ে যমপুরী ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে পৃথিবী থেকে নম্রতা এবং সৌন্দর্য অপসারিত হবে নেমে আসবে নিশিথ অন্ধকার।[৪৭]

বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'বাস্তবিক অলংকার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে।' নজরুলও মনে করেন আভরণ দাসীর চিহ্ন। নারীর হাতের চুড়ি তার বন্ধনেরই প্রতীক। সেই বন্ধন ভেঙে ফেলার আহবান ধ্বনিত হয়েছে এভাবে- 'আঁধারে তোমার পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি।' বন্ধন ছিন্ন হবার জন্য বিচলিত হবার কারণ নেই-বরং প্রয়োজনে নারীকে আরো কঠিন আরো কঠোর বাস্তববাদী হতে হবে। প্রতিশোধের মত শোনালেও কবি বলেছেন জীবনের চাহিদা, সময়ের প্রয়োজনে অমৃত বিলানো হাতে কুট বিষ দিতে। কেন না দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সংগ্রামই নারীকে দিতে পারবে সম অধিকার, মানবিক মর্যাদা। তখনই বলা সম্ভব হবে,

'সেদিন সুদূর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।'[৪৮]

নজরুল মানবতার কবি মানুষের কবি- নারীও মানুষ, নারীর জন্য তাঁর মমত্ববোধ মানবতা বোধেরই বহিঃ প্রকাশ। পুরুষ শাষিত সমাজ নারীর প্রতি যে অন্যায় অবিচারের ফাঁদ পেতে রেখেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে নারীকে সহৃদয় আহবান জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় নজরুলের 'ফণি মনসা' কাব্য। এই কাব্যের 'আশীবাদ' নামক কবিতাটি মূলত শামসুন নাহারের 'পূণ্যময়ী' পুস্তকের প্রশস্তি গাথা হলেও এখানে নারী সম্পর্কে নজরুলের ধ্যান ধারনা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের শত নিষেধের মধ্যেও দুচার জন নারী বিষাদ বাতির সিন্ধু দীপ জ্বেলে বসে আছেন। তারা মনে করিয়া দিচ্ছেন নারীও সমাজকে কিছু দিতে পারেন-তা যত সামান্যই হোক।

'শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী বসে আছে জ্বালি বিষাদবাতির সিন্ধু-দীপ।' [৪৯]

সংবেদনশীল কবি তাঁর সহৃদয় সহানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেন নিশ্চয় নারী একদিন তার নিজের শক্তি সামর্থ এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হবে তখন সে নিজেই বুঝবে তার গৃহ অন্ধ কূপ নয়-সে কল্যাণী নারী, সমাজকে দেবার মত ক্ষমতা সে-ও রাখে। কবি বিশ্বাস করেন নারীকে আর অবরোধ বাসিনী করে রাখা যাবে না। অচিরেই তার বোধোদয় ঘটবে। প্রতিভার বিরল প্রভায় অবরোধের অন্ধকার পেরিয়ে আলোর ঠিকানায় সে পৌছবেই। শামসুননাহারকে আশীবাদ করতে গিয়ে নজরুল সমগ্র নারী জাতিকে আশীবাদ করেছেন-

'আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটিছে আলোকের শত দল কুসুম।
বন্ধকারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয় নিশান
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।' [৫০]

'হেম প্রভা' কবিতায় কবি বাংলার বীর নারীদের ডেকেছেন। দেবী দূর্গা এবং মানবী নারীকে একাসনে বসিয়ে নারীর মর্যাদাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। দুর্গাই যেন নব বাংলার আঁধার হরণকারী চাঁদ সুলতানা।

'এস বাংলার চাঁদ সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাকে পড়েছে সকল কালের
বীর নারীদের ছায়া গো।' [৫১]

Dhaka University Institutional Repository

'সিন্ধু-হিন্দলে' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এই কাব্যের মূলভাব প্রেম। 'অনামিকা' ও 'মাধবী প্রলাপ' কবিতা দুটিতে কবি ইন্দ্রিয়গত প্রেমের নূতন ধারনা দিতে সমর্থ হয়েছেন। সুতীব্র দেহ সম্ভোগ, ভোগ উন্মুখ তৃষ্ণা, দেহকামনা প্রকাশ পাওয়ায় অনেকেই সমালোচনা মুখর হন। কেননা এরকম Sensuous কবিতা নজরুল সাহিত্যে বিরল। সমালোচিত হলেও কবিতা দুটি যে অসাধারণ তা স্বীকার করতেই হয়। 'অনামিকা'- অধরার বন্দনা গান- নজরুলের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। তিনি এক সংগাতীত, জ্ঞানাতীত হৃদয়াকুতির অতৃপ্তি ও বেদনা প্রকাশ করেছেন এই কবিতায়। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতির লীলা রহস্য মানব মনে যে বিস্ময়-বেদনা সৃষ্টি করে তার যথার্থ স্বরূপ চিরকাল রয়ে গেছে অজানা। সেই অচেনা-অজানাকে কুয়াশাচ্ছন্ন জগত থেকে খুঁজে বের করার অভিসার চলছে অনাদিকাল। কিন্তু রহস্যময়ী প্রচ্ছন্নই থেকে যায় নয়ন সম্মুখে আসে না।

'অসীমা! এলে না তুমি সীমা রেখা পারে-
স্বপনে পাইয়া তোমা' স্বপনে হারাই বারে বারে-' [৫২]

'ব্যথা-দেওয়া রাণী' আসেনা 'কথা-কওয়া' হয়ে। এখানেই কবির আফসোস। যে আফসোসকে বলা যেতে পারে প্রেমের বেদনা বিলাস। নজরুল বেদনা বিলাসকে লালন করতে ভাল বাসেন সে কারণেই বোধ হয় অসীমাকে কামনা বাসনার সীমিত সীমার মধ্যে পাওয়ার জন্য তিনি হয়েছেন ব্যাকুল, ক্রন্দনরত, চিরবিরহী।

'মাধবী প্রলাপ' এর মধ্যেও ভোগ উন্মুখ জীবন পিপাসা, কামাতুর প্রেমের নিমিড় সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। বসন্তের আগমনে প্রকৃতির মধ্যে কবি লক্ষ্য করেন সম্ভোগতৃষ্ণার বিচিত্র প্রকাশ। কবিতাটিতে প্রেম প্রকৃতি এলাকার হয়ে ইন্দ্রয়ানুভূতির উষ্ণতাকে মূখ্য করে তুলেছে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন 'কবিতাটিতে একটা মাংসলোলুপতা ফুটে বের হয়েছে। নারীকে শুধু মাংস পিন্ড ভেবে তার বর্ণনা করা হয়েছে।' খোলামেলা এবং প্রেমের দৈহিক অস্বস্তি ও যন্ত্রনার প্রকাশ থাকায় কবিতা দুটি নজরুলের চিন্তা চেতনার দুই বিপরীত ধর্মী আবেগকে প্রকাশ করেছে।

প্রেম মানবতার এক গভীরতম ক্ষুধা-যে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় এক মাত্র প্রেমাস্পদের সংগে মিলনে। অবৈধতা কারোই পছন্দ হবার কথা নয়। নজরুলও পছন্দ করেন নি। 'বধু-বরণ' কবিতায়

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের মাধ্যমে নারীর নূতন জীবনে প্রবেশকে কবি স্বাগত জানিয়ে সামাজিক প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। বিয়ে একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা নারী পুরুষকে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করে। পরস্পরের প্রতি করে আস্থাশীল সহমর্মী এবং শ্রদ্ধা প্রবণ। অবশ্য বিবাহ প্রথা সব সময় মধুরেন সমাপয়েৎ হয় না। তবুও নজরুল এই প্রথার মধ্যেই নারীকে দেখতে চান স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বে, পুরুষের যোগ্য সহধর্মিনী রূপে-পতির সারথি হয়ে সঠিনভাবে জীবন যাপন করার কর্তব্যে-

'বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব
রাঙ্গা মন রাঙ্গা আভরণ
বলো নারী, ''এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ।''
পাপে নয়, পতি পূণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধোনা নয়নে আবরণ;
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ।।'[৫৩]

কাজী নজরুল ইসলামের আরেক খানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'জিঞ্জীর'। প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। এতে সংযোজিত 'মিসেস এম, রমহান' কবিতায় নজরুল মিসেস রহমানের প্রতি যে শোকাকুল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা সহৃদয় পাঠক মাত্রকেই ব্যকুল করে। মাতৃস্বরূপা মিসেস এম, রহমানকে কবি উৎসর্গ করেছিলেন 'বিষের বাঁশী' কাব্য। নজরুল জীবনের বিভিন্ন ক্রান্তি লগ্নে সাহায্য এবং নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই মহীয়সী নারী। প্রমীলা নজরুলের বিয়ের সময় তাঁর ছিল দৃঢ় সমর্থন। তিনি তাঁদের দিয়েছিলেন স্নেহময় আশ্রয়।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও নজরুলের সমকালে নারী সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে যারা একনিষ্ঠ সংগ্রামে অবতীন হয়েছিলেন-তাঁদের মধ্যে অন্যমত ছিলের বেগম রোকেয়া। তাঁর ঘনিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

সহচর হিসেবে কাজ করেছেন মিসেস এম. রহমান, শামসুন নাহার প্রমুখ। তাঁদের সাথে চিন্তা-চেতনায় কর্ম প্রেরণায় নজরুল একাত্ম ছিলেন। নজরুলের বহু গান-কবিতা প্রবন্ধের চিন্তার সাথে রোকেয়ার চিন্তার একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ঠিক তেমনি মিসেস এম. রহমানও তাঁর সমাজ সচেতনতা দিয়ে নজরুলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি নজরুলের মত নাগ অর্থাৎ বিদ্রোহীদের দৃঢ় সমর্থন জানাতেন এবং তাদের জয় যুক্ত করার জন্য প্রেরণা ও শক্তি যোগাতেন। তেজস্বিনী এই মহিলাকে নজরুল উল্লেখ করেছেন 'নাগ-মাতা' বলে 'বিষের বাঁশী' র উৎসর্গ পর্বে এবং এই কবিতায় বলেছেন, 'সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে।' কেন না স্বাধীনচেতা আরব বেদুইন মেয়েদের মত তাঁর মনও কেঁদে উঠতো হেরেমের উঁচা প্রাচীর দেখে। তিনি মনে করতেন 'হেরেম মহল' আসলে 'বাঁদিখানা'। মোহময় নাম দিয়ে এখানে বন্দী করে রাখা হয় নারীদের। প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন-

'নারীদের এই বাঁদি করে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে।'[৫৪]

তিনি জানিয়ে দিলেন-

'বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাস, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বার মাস।
হাদিস, কোরান, ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে নাক' তারা কোরানের বাণী-সমান নর ও নারী,
শাস্ত্র ছাঁকিয়ে নিজেদের মত সুবিধা বাছাই ক'রে
নারীদের বেলা গুম্ হয়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে।' [৫৫]

নজরুলের ভাষায় মিসেস এম. রহমান -

'দিনের আলোকে ধরে ছিলে এই মুনাফেকদের চুরি
মসজিদে বসে স্বার্থের তরে ইসলামে হানে ছুরি।' [৫৬]

সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা নজরুলের শ্রদ্ধার কারণ। [৫৭] 'বাঙলারা অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা কুল- গৌরব' মাসুদা খাতুনের (মিসেস এম. রহমানের আসল নাম) প্রতি এই বিরল শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে কবি নজরুল মূলত নারী জাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'জিঞ্জীর' কাব্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 'অগ্রপথিক' কবিতাটি। সুইটম্যানের অনুরণনে লিখিত এই অনুবাদমূলক কবিতাটি নবজাগরণের চেতনায় উচ্চকিত। স্বদেশের শৃংখল মোচনের জন্য পিছিয়ে পরা কুসংস্কার আচ্ছন্ন ধর্মান্ধ সমাজকে জাগাতে কবি যেমন তরুণদের ডাক দিয়েছেন-তেমনি সম-মর্যাদায় ডাক দিয়েছেন তরুণীদেরও। নব আশায় উদ্দীপ্ত প্রাণে জাগতে বলেছেন নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণীদের। তরুণদের পাশাপাশি তরুণীরা এগিয়ে না এলে চলার পথ সুন্দর এবং সাফল্য মন্ডিত হতে পারে না।

'ওগো ও প্রাচীর-দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা! ডাকে সংগীরা।
তোমরা নাইগো লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি'
আমাদের পথে চল-চপল' [৫৮]

'চক্রবাক' (১৯২৯ খ্রীঃ) নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেম মূলক কাব্য গ্রন্থগুলির অন্যতম। এই কাব্যের মূল সুর প্রেম বিরহ। [৫৯] পুরাতন সস্মৃত তাঁর চিত্তকে মথিত করেছে- তাঁর হৃদয় চক্রবাক চক্রবাকীর জন্য প্রকৃতির মধ্যে বিচরন করছে। চক্রবাকীর উদ্দেশ্য তাঁর আর্তি-

'যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরনীয় পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি-
খুঁজিবে সাগর-মরু-প্রান্তর গিরিদরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি-
এই বালু চরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি।' [৬০]

বিসন্ন ব্যথার সকরুণ রাগিনী- নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দুঃসহ বেদনায় 'চক্রবাকে'র কবিতা গুলো যেন বিরহীর দীর্ঘশ্বাস।

'পূজারিণী' কবিতার মত নারী এখানে পাষাণ প্রতিমা. তার আচরণ নিষ্ঠুরতায় ভরা, হৃদয় কঠিন। নারীর এই নিরশ্রু নিষ্ঠুর কঠোরতা - প্রেমিক কবিকে করেছে ক্ষুব্দ যন্ত্রনা ক্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

অভিমানী এবং বিরহ কাতর। একটি অতল- গহীন বিরহ বেদনার সুরই কাব্য সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে চক্রাবাক কাব্যে। না পাওয়ার বেদনায় মুর্ষে পড়লেও কবি প্রিয়ার জন্য গান রচনা করবেন, এই অহংকারে তিনি উল্লাস বোধ করেন।

'নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায়!
তোমার রূপে আমার ভূবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন।

কাজ কি জেনে কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার,
আমি তোমার গাঁথছি মালা এ মোর অহংকার।' [৬১]

প্রেমের এই সুক্ষ্ম তত্ত্ব কবিতাটিকে উচ্চস্তরে উন্নিত করেছে। প্রিয়া নিখিল রূপের রাণী মূর্তিতে কবির স্বপ্নে প্রতিভাত হয়েছে। ধরা পড়েছে প্রিয়ার শ্বাশত রূপ যে প্রিয়ার সথে তাঁর নিত্য কালের সম্পর্ক। যাকে নিয়ে তিনি মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ গড়ে তুলতে চান।

১৯২৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ খানি। 'সন্ধ্যা' ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যহীন সময়ের প্রতীক বলে গণ্য হলেও এখানে সংকলিত 'বাংলার আজিজ' নামক শ্রদ্ধা কবিতায় তিনি আব্দুল আজিজের কর্ম কান্ডের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। চট্রগ্রামের স্কুল ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের সহায়তায় ও অনুপ্রেরণায় অবরোধ এবং পর্দার বেড়া জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে বসেছিলেন তাঁর যোগ্য নাতনী- তেজস্বী শামসুন নাহার। নারী মুক্তির অগ্রপথিক তরুণদের প্রতিনিধি 'মশালবাহী বিশাল পুরুষ' আব্দুল আজিজকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নজরুল লিখেছেন-

'লায়লা চিরে আনলে নাহার রাতের তারা-হার!
সাম্যবাদী! নর-নারীরে করিতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান! '[৬২]

বিপ্লবাত্মক, অগ্নিগর্ভ কবিতা সংকলন 'প্রলয় শিখা' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীঃ। নিজের নামে ও নিজের দায়িত্বে এই গ্রন্থ নজরুল প্রকাশ করলেও তা রাজদ্রোহে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু এটা বিপ্লবাত্মক বই এখানে নব জাগরনের কথা বিদ্রোহের বাণী আছে সেই সাথে আছে নারী জাগরণের আহবান। তবে সরাসরি নয় প্রচ্ছন্নে। 'বহ্নি-শিখা' কবিতায় স্বাহা বা অগ্নির স্ত্রীকে বিচিত্ররূপে জ্বলে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। 'রক্তাম্বর ধারিনী মা' অথবা 'আগমনী' কবিতায় যেমন ডেকেছেন দেবী চন্ডীকে। স্বাহাকে কবি কখনো ক্রোধে, কখনো শোকে-প্রতিশোধে জ্বলে উঠতে বলেছেন-

'মেলি শত দিকে শত লেলিহান রসনা
জাগো বহ্নি-শিখা স্বাহা দিগ্ বসনা।
জাগো রূদ্রের ললাটের রক্ত-অনল

জাগো ক্রোধাগ্নি অবমানিতের বক্ষে,

জাগো প্রতিশোধ রূপে উৎপীড়িত বুকে
জাগো ভীমা-ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী, ' [৬৩]

'নির্ঝর' প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ এ। 'অভিমানিনী' কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে কবির সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন-অভিমান ভালবাসার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিচ্ছেদ এবং সত্যিকারের প্রেম বিচ্ছেদের শেষে মিলনে সার্থক হয়।

কবি নজরুল অসুস্থ হবার পর ১৯৪৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় 'নতুন চাঁদ'। এবং 'শেষ সওগাত' নামে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। 'শেষ সওগাত' গ্রন্থে 'নারী' নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা আছে। আবেগদীপ্ত এই কবিতাটিতেও প্রকাশ পেয়েছে নারীর প্রতি তাঁর সীমাহীন আন্তরিকতা। কবিতার প্রথমেই আবেগ মথিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

'হায় ফিরদৌসের ফুল!
ফুটিতে আসিলে ধুলির ধরায় কেন?
সেকি মায়া? সে কি ভুল? '

কবি মনে করেন এই ফিরদৌসের ফুলে ট্ট

Dhaka University Institutional Repository

'স্রষ্টা হইল প্রিয়-সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি
কল্প তরুতে ফুটিল প্রথম নারী আনন্দ কলি!' [৬৪]

প্রস্ফুটিত আনন্দ কলি নারী-রস দীপে জ্বেলে ভূবনের ভবন আলোকিত করছে। নারী এসেছে বলেই 'সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব'। নজরুল নারীতে প্রত্যক্ষ করেন সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য। মানব জীবন সৃজনে কখনো নারী স্তন্য দাত্রীমাতা, প্রিয়ার প্রেম বন্ধন আবার কখনো চলার পথে প্রেরণা দাত্রী-

'যতবার নিভে যায় আশা-দীপ,ততবার তুমি জ্বালো,
শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁধারি আলো।'[৬৫]

আলোক বাহী নারীকে কবি নজরুল হৃদয়ের উদারতায় সালাম জানান-

'সালাম লহো গো প্রণামলহ গো প্রকৃতি পূণ্যবতী-
তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দ-ধামের জ্যোতি।'[৬৬]

কিন্তু প্রকৃতির মত সহজ-সরল প্রেমময়ী সৃষ্টিশীল এই নারী যুগ যুগ ধরে তার স্বজন পরজন দেশ জাতির কাছ থেকে কি পায়? তার প্রাপ্য অপমান, লাঞ্ছনা, বাঞ্ছনা। কবি দুঃখের সাথে অনুভব করেন-

'যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়।'[৬৭]

নারীর কল্যাণজয়ী রূপকে অবজ্ঞা করায়-

'অভিশপ্ত যে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তিহীন,
শোধ করে নি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ।
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা-করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান! '[৬৮]

স্বত:স্ফূর্তভাবে মানবিকতাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল নারীর পক্ষে দাঁড়িয়ে নারীকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়।নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে না করে তিনি মনে করেন-

'আজও রবি শশী-ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে,
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।'[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

এবং

'নারীর পূণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব!'[৭০]

এত নারী বন্দনার পরেও কবির অতলদর্শী ভবিষ্যৎ বাণী আমাদের মুগ্ধ করে। 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন' কবিতায়-নারীর অমিত তেজের সম্ভাবনার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। সময়ের প্রয়োজনে কোমলমতি নারীই হানতে পারে শত্রুর বুকে শেল-

'শাড়ি-মোড়া যেন আনন্দ-শ্রী দেখো বাঙলার নারী,
দেখনি এখনো, ওঁরাই হবেন অসি-লতা তরবারি!
ওরা বিদ্যুল্লতা-সম, তবু ওরাই বজ্রহানে,
ওরা কোথা থাকে তোমরা জান না, সাগর ও মেঘ জানে।

ওরা যেন ভীরু পর্দানশীন! ওরাই সময় হলে
ঘন ঘন ছোঁড়ে অশনি অত্যাচারীর বক্ষতলে!'[৭১]

প্রজ্ঞাবান কবির এ শুধু কবি কল্পনা ছিল না। বাংলার নারীরা বহুবার এ কল্পনার বাস্তব রূপ দিয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে এই বাংলার মেয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তেভাগা আন্দোলনে লীলা মাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন-বাংলার নারী আসলেই আগ্নেয়গিরির জ্বালাময় লাভা। এদের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে কবির কথার সত্যতা রেখেছে বাংলার নারী।

নজরুলের মত নারীর বন্দনা বাংলার কোন কবি করেছেন বলে জানা যায় না। তবু সমালোচকগন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। কেউ বলেছেন নজরুলের যে নারী জাগরণ মূলক কল্পনা তাতে আধুনকি মননশীল নারীর স্থান হয়নি- মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারনা তার কল্পনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার কেউ বলেছেন নারী তাঁর কাছে প্রেম ভোগের সামগ্রী। নারীর প্রতি বর্ষণ করেছেন কটু-অশোভন বাক্য। নারী তাঁর চোখে কখনও রাণী-কখনও ভিখারিণী। অর্থাৎ মহৎ-কুৎসিত দুই রূপেই তিনি নারীকে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একথা ভুললে চলবে না- নর বা নারী যে চরিত্রই হোক না কেন- দোষে গুনে মানুষ। এক তরফা ভাবে ভাল বা মন্দ কেউ নয়। নজরুলের দেখা নর নারীও রক্ত-মাংশের মানুষ। তিনি জোর করে কাউকে ভাল বা মন্দ রূপে দেখান নি। জীবনের দাবীতে যে যেমন তাকে তেমন ভাবেই দেখিয়েছেন। তাই একক কোন স্থির সিদ্ধান্ত বা প্রত্যয়ে তিনি আসেন নি। বরং বহু বিচিত্র প্রত্যয়ের সহ অবস্থান এবং পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ্যে তিনি স্বাচ্ছন্দবোধ করেছেন। নারীর প্রতি তাঁর যে সহমর্মিতা তা কোন দার্শনিকের স্থির সিদ্ধান্ত নয়-তাঁর মননশীলতা তাঁর হৃদয় জাত সহানুভূতি। সংবেদনশীল মনের একেবারেই স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়- যুক্তি তর্কে তুললে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য, উবে যায় সৌরভ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

(১) 'একালে নজরুল ' - আহমদ শরীফ-মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ১৯৯০, পৃঃ ৯৯৩

(২) 'রক্তাম্বর ধীরিণী মা', নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ১১

(৩) 'রক্তাম্বর ধীরিণী মা', নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ১১

(৪) 'রক্তাম্বর ধীরিণী মা', নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ১২

(৫) 'আগমনী', নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ১৪

(৬) আলাউদ্দীন-আল-আজাদের প্রবন্ধ (নজরুল জন্ম শতবর্ষ বক্তৃতামালা) নজরুল ইন্সষ্টিটিউট, জুন ১৯৯৫/ আষাঢ়, ১৪০২

(৭) 'নজরুল চরিতমানস' - ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত। দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ= ১৩৮৪. পৃঃ ১২৭

(৮) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা', নজরুল রচনাবলী. ১মখন্ড,পৃঃ ৬৩

(৯) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা', নজরুল রচনাবলী, ১মখন্ড,পৃঃ ৬৩

(১০) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা', নজরুল রচনাবলী, ১মখন্ড,পৃঃ ৬৬

(১১) 'পুজারিনী' 'দোলনাচাঁপা', নজরুল রচনাবলী, ১মখন্ড,পৃঃ ৬৬

(১২) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা ', নজরুল রচনাবলী. ১মখন্ড,পৃঃ ৭১

(১৩) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা ', নজরুল রচনাবলী, ১মখন্ড,পৃঃ ৭২

(১৪) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা ', নজরুল রচনাবলী, ১মখন্ড,পৃঃ ৭২

(১৫) 'পুজারিনী ' 'দোলনাচাঁপা ', নজরুল রচনাবলী, ১মখন্ড,পৃঃ ৭৪

(১৬) 'কবি-রাণী ' 'দোলন-চাঁপা ', নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮১

(১৭) 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা ' - মুজফ্ফর আহমদ, পৃঃ ১৩৫-১৩৬

(১৮) 'বিজয়িনী ' 'ছায়ানট ', নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৩

(১৯) 'সাধের ভিখারিণী ' 'দোলন-চাঁপা ' রচনাবলী ১ম খন্ড. পৃঃ ৮১

(২০) 'নজরুল প্রসঙ্গে' - রফিকুল ইসলাম- নজরুল ইন্সষ্টিটিউট-ঢাকা-অগাষ্ট ১৯৯৮, পৃঃ ৪৫-৪৬

(২১) 'উৎসর্গ ' - 'বিষের বাঁশী ' -নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড-পৃঃ ৮৭

(২২) 'মিসেস এম, রহমান ' 'জিঞ্জীর ' - নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড

(২৩) ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত, 'নজরুল চরিত মানস', পরিমার্জিত ও পরিবধিত দে'জ সংস্করন- জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃঃ ১৮৫-১৮৬

(২৪) 'মিসেস এম, রহমান ' 'জিঞ্জীর ' নজরুল রচনাবলী - ১ম খড. পৃঃ ৪৩৩

(২৫) 'জা গৃহি' 'বিষের বাঁশী' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ১০১

(২৬) 'তূর্য নিনাদ' - 'বিষের বাঁশী' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ১০২

Dhaka University Institutional Repository

(২৭) 'বিজয় গান ' - 'বিষের বাঁশী ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ১২১

(২৮) 'মোহান্তের মোহ -অন্তের গান ' - 'ভাঙার গান ' নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৭

(২৯) 'বড়দিন ' 'শেষ সওগত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড- পৃ৩১৯

(৩০) 'নজরুল জীবনী ' ডঃ রফিকুল ইসলাম, পৃঃ ২২১

(৩১) 'চৈতী হাওয়া' 'ছায়ানট' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ১৬৪

(৩২) 'চৈতী হাওয়া' 'ছায়ানট'- নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৭

(৩৩) 'মানস বধূ ', ' ছায়ানট ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮১

(৩৪) ' প্রিয়ার রূপ' ' ছায়ানট ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৪৭

(৩৫) 'আল্‌তা-স্মৃতি', ' ছায়ানট ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৭

(৩৬) 'আল্‌তা-স্মৃতি ', ' ছায়ানট ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৮

(৩৭) 'আশা' ' পুবের হাওয়া ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড,পৃঃ২২৭

(৩৮) 'কাজী নজরুল ইসলাম- স্মৃতিকথা ' -মুজাফফর আহমদ-পৃঃ ২৮৪

(৩৯) 'বারঙ্গনা ', 'সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪০

(৪০) 'বারঙ্গনা ', ' সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪০

(৪১) 'নারী ' ,' সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪১

(৪২) ' নারী ', ' সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪১

(৪৩) 'নারী ', 'সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪২

(৪৪) 'নারী ', 'সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪২

(৪৫) 'নারী ', 'সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪২

(৪৬) 'নারী ', 'সাম্যবাদী '- নজরুল রচনাবলী-১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৩

(৪৭) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম রোকেয়া রচনাবলী, আব্দুল কাদির (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা- পৃঃ ১৩, দ্বিতীয় মুদ্রন, ১৯৮৪

(৪৮) ' নারী ' ' সাম্যবাদী ' নজরুল রচনাবলী- ১ম খন্ড-পৃঃ ২৪৩

(৪৯) ' আর্শীবাদ ' , 'ফণি-মনসা ' - নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ৩০৯

(৫০) ' আর্শীবাদ ' , 'ফণি-মনসা ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ৩০৯

(৫১) 'হেম প্রভা ', 'ফণি-মনসা ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ৩১৫

(৫২) ' অ-নামিকা ', ' সিন্ধু-হিন্দোল ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫১-৩৫২

(৫৩) 'বধূ বরণ ' ,' সিন্ধু-হিন্দোল ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৬

(৫৪) 'মিসেস এম, রহমান ', 'জিঞ্জীর ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

(৫৫) 'মিসেস এম, রহমান ', 'জিঞ্জীর '- নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৩

(৫৬) 'মিসেস এম, রহমান ', 'জিঞ্জীর ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৩

(৫৭) 'নজরুলের নায়ক-নায়িকা ' ,' নজরুল প্রসঙ্গ ' - রফিকুল ইসলাম, পৃঃ ৪৬

(৫৮) 'অগ্র-পথিক ', ' জঞ্জীর ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ৪৫৪

(৫৯) 'নজরুল চরিত মানস ' - ডঃ সুনীলকুমার গুপ্ত - পৃঃ ১২৭

(৬০) 'ওগো ও চক্রবাকী ', 'চক্রবাক ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ৪৮০

(৬১) 'এ মোর অহংকার ', 'চক্রবাক ' - নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ৫০৪

(৬২) 'বাংলার আজিজ ', 'সন্ধ্যা ', নজরুল রচনাবলী - ১ম খন্ড-পৃঃ ৫৫১

(৬৩) 'বহ্নি-শিখা ' ,' প্রলয়-শিখা ', নজরুল রচনাবলী - ২য় খন্ড-পৃঃ ৫৭

(৬৪) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০০

(৬৫) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০১

(৬৬) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০১

(৬৭) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০১

(৬৮) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০২

(৬৯) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০২

(৭০) 'নারী ', ' শেষ সওগাত ', নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০২

(৭১) 'আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন ' ' শেষ সওগাত ' - নজরুল রচনাবলী - ৩য় খন্ড-পৃঃ ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের গল্প সাহিত্যে নারী

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর কৈশোর জীবনেই। 'লেটোর' দলে গান রচনার মধ্যদিয়ে তিনি গীতিকার হিসেবেও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে ছিলেন । শৈলাজানন্দ স্মৃতি চারণে লিখেছেন যে, নজরুল স্কুলে পড়া অবস্থায় গদ্য রচনা করতেন। 'আমি লিখি কবিতা ও লেখে গল্প।'[১] তিনি নিজেই লিখেছেন 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে'।[২] তাছাড়া পল্টনে যোগ দিয়েও যে তিনি গদ্যচর্চা বাদ দেন নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বে প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি রচনায় । 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' (১৯১৯) 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' 'ব্যথার দান' (১৯২২) সে সময়ে লেখা নজরুলের গদ্য রচনা । এই হিসেবে কবি নজরুলের অগ্রজ গদ্য শিল্পী নজরুল।

সাহিত্যে গদ্য যেহেতু নাগরিক মাধ্যম সেহেতু আধুনিকতার সংগে তা সম্পৃক্ত । লেখকের আঙ্গিক চেতনাও আধুনিকতা তাই প্রায় সমার্থক ভাবে গন্য করা হয়। সেই বিচারে নজরুলের গদ্যে সমালোচকগণ আবিস্কার করেন অপরিমেয় আবেগ, কাব্যাক্রান্ততা, কাহিনীর প্রেক্ষাপট নির্মাণে ব্যর্থতা ইত্যাদি ত্রুটি যা তারা বিবেচনা করেন আধুনিক মননশীল রচনার পরিপন্থী রূপে । তবে এঁর বিপরীত আলোচনাও আছে। সে প্রসংগে যাবার অবকাশ এখানে নেই। শিল্প মূল্যের চেয়ে নারীকে, নারীর মূল্যকে নজরুল কি ভাবে তুলে ধরেছেন তার অনুসন্ধানই মুখ্য।'ব্যথার দান' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলন। প্রথম গল্পের নামই 'ব্যথার দান' । মোট তিনটি চরিত্র সমন্বয়ে এ গল্প রচিত। দারা, বেদৌরা, সয়ফুলমুলক। দারার প্রেমিকা বেদৌরা । দারা যুদ্ধরত থাকা অবস্থায় বেদৌরা সয়ফুলমুলক নামের তরুণের প্ররোচনায় বিপথ গামী এবং পদস্খলিত হয়। তার এই ভুল আমরণ দংশন করতে থাকে তার বিবেককে। দারাও দ্বিধান্বিত সে কি ক্ষমা করবে বেদৌরাকে ? বেদৌরাকে বিপথে নেয়ার অনুশোচনায় সয়কুলমুলক ও বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত ।

শেষ পর্যন্ত প্রেমিক এবং মহানুভব দারা ক্ষমা করে বেদৌরাকে। পদস্খলনের পরও বেদৌরাকে ক্ষমা করার উদারতা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এক সাহসী পদক্ষেপ, নারীর প্রতি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন নজরুল দারার মাধ্যমে ।

Dhaka University Institutional Repository

'ব্যথার দান' এর দ্বিতীয় গল্প আফগান বীরাঙ্গনা হেনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে । প্রেমিককে বীর যোদ্ধা রূপে দেখতে চেয়ে হেনা বারবার তাকে প্রত্যাক্ষান করেছে। প্রেমিক সোহরাব যেদিন সত্যিই যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত তখন হেনা জানালো সে সোহরাবকে সত্যি সত্যিই ভালবাসে । তার এই ছলনার কারণ সে সাধারণ আর দশ জনের মত পুরুষ পছন্দ করে না । তার প্রেমিক হবে দেশ প্রেমিক আদর্শ অটল । হেনার এই চাওয়াও কিন্তু সাধারণ থেকে আলাদা, যা সহজেই তাকে স্বতন্ত্র করেছে। অসাধারণ মানসিকতা না থাকলে এমন আকাঙ্খা করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় গল্পের নাম 'বাদল বরিষণে'। নায়িকার নাম কাজরিয়া । কাজরিয়া কালো মেয়ে তার এই গাত্র বর্ণ তাকে প্রতি নিয়ত হীনমন্যতায় ভোগায়। তার ধারনা কালো বলে কেউ তাকে ভালবাসে না । ভালবাসতে পারবে না বরং তার ভাগ্যে আছে অবহেলা আর উপহাস। এই বোধ মনের মধ্যে সারাক্ষন কাজ করে বলে সে স্বাভাবিক স্বভাবে আচরণ করতে পারে না । চাপা অন্তর বেদনা তাকে অভিমানী করে তোলে । ভিনদেশী এক শ্যামল বরণ যুবক কাজরি'র শ্যামলা রূপে মুগ্ধ হয়ে ভালবাসে তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুখ সয়না, মৃত্যু এসে কেড়ে নেয় পরম পাওয়া প্রেম। প্রকৃতির দুলালী কাজল কালো মেঘের মতন বাদল বরিষণে মিশে যায় প্রকৃতির মাঝে । তার এইমৃত্যু অনুভূতিকে বেদনা আচ্ছন্ন করে মনের কোণে জমে উঠে সহানুভুতি।

পরের গল্প 'ঘুমের ঘোরে '। নায়ক আজহার, নায়িকা পরী। আজহার পরীকে ভালো বাসে ঠিকই কিন্তু শারীরিক ভাবে কামনা করে না । সে মনে করে যে ভালবাসা দেহকে আকর্ষণ করে তা ভালবাসা নয় - কামনা। তার ভালবাসাকে শেষ পর্যন্ত বন্ধুর হাতে তুলে দেয় এবং নিজে চলে যায় যুদ্ধে। পরীও চায় না তার ভালবাসা প্রেমিকের কর্তব্যে বাঁধার সৃষ্টি করুক। পরীর স্বামীও উদার মানসিকতার । সব জেনে শুনেই সে পরীকে গ্রহণ করে শোনায় নির্ভরতার বাণী-

'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির
উঠ-বীর জায়া, বাঁধো কুন্ডল, মুছ এ অশ্রু-নীর । '

Dhaka University Institutional Repository

পরীর স্বামীর এই উদারতা নারীর প্রতি তার প্রগতিশীল চিন্তারই বহিঃ প্রকাশ। নজরুলের চিন্তা চেতনা এই গল্পে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত । তিনি চাইছিলেন জীবনে সমস্যা এলে নর ও নারী দু জনে মিলেই সে সমস্যার সমাধান করতে হবে । তা হলে সমাজে সমস্যার পাহাড় জমবে না । নজরুলের সমসাময়িক কালে পরী, পরীর স্বামীর উদার মানসিকতা সত্যি ব্যতিক্রমের দাবী রাখে। প্রগতিশীল মানসিকতা সম্পন্ন পরী, নজরুল সৃষ্ট এক উল্লেখ্য যোগ্য নারী চরিত্র।

বাল্য প্রেম এবং বিচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে 'অতৃপ্ত কামনায়'। অবরোধ যুগের এক বাস্তব চিত্র এঁকেছেন গল্পকার নজরুল। মাত্র এগার বছর বয়সের একটি চঞ্চল হাস্যউজ্জ্বল কিশোরীকে চার দেওয়ালে আটকে ফেলা হলো, মোতির সাথেই অন্দর মহলে বন্দী হলো মুক্তি, মুক্ত জীবনের স্বাধীনতা । 'সমাজ বললে রাখ তোর এ মুক্তি- আমি এই দেওয়াল দিলাম।' অবরোধ বাসিনী নারীই শুরু নয়, কিশোরীর জন্যও দরদ অনুভব করেছেন নজরুল ।

'ব্যথার দানের' শেষ গল্প 'রাজবন্দীর চিঠি '। ক্ষয় রোগ গ্রস্থ রাজবন্দী শ্রী ধূমকেতু স্মৃতি চারণ করে পত্র লিখেছে তার প্রেয়সী মনীষাকে চিঠিতে সে ব্যক্ত করেছে ব্যর্থ প্রেমের কথকতা । রাগে-দুঃখে অভিমানে নারী জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে ব্যর্থতার দ্বায় দায়িত্ব । সে মনে করে-

(ক) 'পুরুষ জন্ম জন্ম সাধনা করে ও নারীর মন পাচ্ছে না । নারীর অন্তরের রহস্য বড় জটিল, বড় গোপন। নারী সব দিতে পারে কিন্তু তার মনের গোপন কুঞ্জিকাটি যেন কিছুতেই দিতে পারে না ।'

(খ) 'তোমরা নারী তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে স্নেহ করা, সেবা করা, যে কেউ হোক না কেন, তার দুঃখ দেখলে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে । একটু সেবা করতে ইচ্ছে হয়। ওতে তোমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। তোমরা দেবী, সন্ন্যাসিনী । এই ব্যথিতের ব্যথা মুছাতে তোমরা সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পার। কিন্তু তাই বলে সবাইকে ভালবাসতে পার না আর ভালবাসও না । '

Dhaka University Institutional Repository

(গ) 'তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব বেশি শ্রদ্ধা করি। প্রাণ হতে তাদের মঙ্গল কামনা করি। কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন রয়ে গেল যে তারা পুরুষের ভালবাসার বড় অনাদর করে। বড় অবহেলা আপমান করে। তারা নিজেরাও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী করতে পারে না । আমাদের সমাজের বেদনার সৃস্টি এই খানে। যে তাকে সকল রকমে সুখী করে তার বাহির ভিতরে রানী করে দেবী করে রাখতে পারতো, রূপ-যৌবন-গরবিনী নারী তাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়। সে হতভাগ্যের রক্ত-ঝরা প্রানের ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে আলতা পড়ে।'[৬]

উদ্ধৃতি গুলো ধূমকেতুর জবান বন্দীতে যেন নজরুলের নিজস্ব নারী ভাবনার একটি দিক বের হয়ে এসেছে। এরকম আবেগ উদ্বেল - না পাওয়ার বেদনা নজরুলের বহু রচনায় দেখতে পাওয়া যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের উল্লেখ যোগ্য গল্প গ্রন্থ 'রিক্তের বেদন'। এটি তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন, প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রীঃ। প্রথম গল্পের নাম 'রিক্তের বেদন'। রোজ নামচার (ডাইরী) আংগিকে লেখা । দেশ মাতার ডাকে উদ্বুদ্ধ নিষ্ঠাবান সৈনিক হাশিম । তাকে কেন্দ্র করে আর্বতিত দুই নারীর জীবন ।

শাহিদা প্রথম নারী যে হাশিমের গোপন ভালবাসা। দ্বিতীয় জন গুল, সে বেদুঈন মেয়ে, মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত । কিন্তু বাঙালী মেয়ে শাহিদা সমাজ খাঁচার অবরোধ বাসিন্দা। তার নিজের মতামত ব্যক্ত করার কোন অধিকার নেই - সাধ্য ও নেই । স্বাভাবিক ভাবেই অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় শাহিদার। দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হাশিম দুই নারীর হৃদয়াবেগকেই উপেক্ষা করে । কেন না তার বিশ্বাস দেশ প্রেমের কাছে নর নারীর প্রেম তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত গুলের ভালবাসায়ও সে সাড়া দেয়নি। গুল অস্ত্র অপহরণ করতে এসে নিয়তীর পরিহাসে হাশিমের গুলিতে প্রণ হারায়।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক লেখায় দেখা গেছে নজরুল মধ্যযুগীয় ভাব ধারায় নারীকে প্রগতির পথে অন্তরায় বলে ভেবেছেন। 'রিক্তের বেদন' গল্পটি সেই ধাঁচে লেখা । এখানে হাশিমের দেশ প্রেমের বা কর্তব্য কর্মের বাঁধা যেন দুই নারী শাহিদা এবং গুল।

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' এক সৈনিক তরুণের স্মৃতি রোমন্থন মূলক কাহিনী । এ গল্পের নায়ক যখন থার্ড ক্লাসের ছাত্র তখন তার বাবা-মা তের বছরের কিশোরী রাবেয়ার সাথে তার বিয়ে দেয়। নায়ক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কলেজে গেলে রাবেয়া রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। শোক কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে ছেলের বাবা মা তাকে আবার সখিনার সাথে বিয়ে দেয়। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার স্মৃতি তাকে দ্বিতীয় স্ত্রীর ভালবাসার অনুরাগী হতে আন্তরায় সৃষ্টি করে। সখিনা যখন স্বামীর এই মনোভাব বুঝতে পারে তখন অভিমানে মনেকষ্টে অল্প দিনের মধ্যে তারও মৃত্যু হয়।

একে বারেই অপরিণত বয়সের কিশোরী নায়িকা এবং জীবন সম্বন্ধে ধারনা জন্মানোর আগেই তারা পরপারে পাড়ি জমায়। এদের জন্ম যেন বিয়ের পণ্য হবার জন্য। 'মেহের নেগার' গল্পের প্রধান চরিত্র বাইজী কন্যা গুলশন্। রূপ পসারিণীর কন্যা বলে যে নিজেকে ঘৃণা করে; সারাক্ষণ হীনমন্যতায় ভোগে । অপবিত্র জঠরে জন্ম হয়েছে ভেবে সে তার প্রেমিকের অকৃত্রিম ভালবাসও গ্রহণ করতে পারে না। মনের নিভৃতে লালন করা প্রেমকে অবদমিত করতে যেয়ে প্রবল অর্ন্তবেদনা এবং অর্ন্তদ্বন্দ্বে ভোগে । মিলন হয় না প্রেমাস্পদের সংগে, মৃত্যু এসে জুড়িয়ে দেয় সব জ্বালা। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই মুছে যাক তার জন্মের গ্লানি, তা বোধ করি সে চায় নি। চায় নি বলেই কবরের শিয়রে স্মৃতি ফলকে লিখে রাখতে অনুরোধ করে 'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলে' ওগো পথিক আমায় ঘৃণা করো না! আমি অপবিত্র কিনা জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল ।'[৭]

এই অনুরোধের মাধ্যমে গুলশন্ চরিত্রে ভিন্ন এক মাত্রা সংযোজিত হলেও তার করুণ পরিনতি বেদনাবহ। 'বারাঙ্গানা' কবিতায় কবির যে বিপ্লবী উদার মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে 'মেহের-নেগারে' তা হয় নি

Dhaka University Institutional Repository

'সাঁঝের তারা ' রূপক ধর্মী গল্প হলেও এখানে নজরুল নারীর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ঠকে তুলে ধরেছেন । সমাজে নারীর যে অবস্থান তাতে সে সহজে বিদ্রোহ করে বিদ্রোহিনী হতে পারে না । তার কল্যাণ মূর্তিই সবার কাম্য । যা হোক, গল্পের নায়ক তার কাঙ্খিত প্রেয়সীকে পায় নি, কেন না সে সৃষ্টি-ছাড়া পথ হারা। বহু কবিতায় নজরুল তুলে ধুরেছেন নারীর কল্যাণী রূপ। 'সাঁঝের তারা' গল্পেও বলেছেন, 'সে যে নারী কল্যাণী । সে-ই না বিশ্বকে সহজ করে রেখেছে, তার অনন্ত ধারাটিকে অক্ষুন্ন সামঞ্জস্য দিয়ে ঘিরে রেখেচে।'[৮]

'রিক্তের বেদন' গল্প গ্রন্থের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প 'রাক্ষসী' । স্বামী হন্তা এক বাগদী মেয়ে বিন্দির জীবন কথা । দুটো মেয়ে আর 'ভালোমানুষ স্বামী' নিয়ে তার সংসার। পরিশ্রমী বিন্দি,হিসাব করে কায় ক্লেশে সংসার চালায় । তবে ভালোমানুষ স্বামী দেবতাটি যে দিন রাঘো বাগদির দু'তিনটে 'সাঙ্গাকরা' 'কড়ুই রাড়ী' মেয়েকে নিয়ে মজলো, সেদিন মাথা ঠিক রাখা সম্ভাব হলো না তার। স্বামীকে ঝাঁটা পেটা করতেও ছাড়েনি সে । কিন্তু স্বামী যে দিন কষ্টে সঞ্চিত পয়সাকড়ি নিয়ে হবু শ্বশুর কে বিয়ের ভেট দিয়ে বিয়ের তারিখে পর্যন্ত ঠিক করে আসে - সে দিন বিন্দি তার কর্তব্য কর্ম স্থির করে ফেলে । তার মনে প্রশ্ন জাগে-

'একটা দেবতার মত লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক পা এক পা করে, আর বেশিদূর নাই, অথচ ফিরবার কোন উপায় নাই । তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয় ? তাছাড়া আমি তার স্ত্রী আমারও একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায় ত আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে ? আর সে এই রকম বে পথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী । ধর আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তা হলে তার ত আর কোন পাপ থাকবে না । যত পাপ হবে আমার । তা হোক সোয়ামির পাপ তার ইস্ত্রি নেবে না ত কি নেবে এসে শেওড়া গাছের ভূত ? '[৯]

স্বামীকে পাপ পথ থেকে পর নারীর আসক্তি থেকে উদ্ধার করতে তাকে হত্যা করেছে। এনিয়ে বিন্দির কোন অনুতাপ নেই কারণ সে মনে করে স্বামীকে সে অপরাধ করতে না দিয়ে নরক যাত্রা থেকে রক্ষা করেছে । এটাকে সে সঠিক বলেই মনে করে । জীবনের দৃঢ় বাস্তবতায় বিন্দি চিনেছে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের অসঙ্গতি সমূহ। এ সমাজে নারী মর্যাদাহীন । আইন

Dhaka University Institutional Repository

তাকে শাস্তি দিয়েছে সে শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে কিন্তু সমাজ তাকে জেল থেকে বের হবার পরও রেহাই দেয়নি বরং ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান, নির্যাতনে জর্জরিত করেছে । এখানেই বিন্দির দুঃখ, পুরুষ সাত খুন করেও পাড় পেয়ে যায়, সে নারী বিধায় তার অপরাধ সীমাহীন । কিন্তু তাতে বিন্দি ভেঙে পড়ে না প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রাম করে জীবন এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিন্দি চরিত্রের মাধ্যমে নজরুল একটি বিশেষ প্রতিবাদী এবং নারীর বিশেষ মনস্তত্বের অবস্থাকে চিত্রিত করেছেন। 'স্বামী হারা' গল্পে সমাজের নিগ্রহের শিকার হয়েছে বিধবা বধূ বেগম । বাবা মায়ের মৃত্যুতে দরিদ্র ঘরের অনাথ বেগমের দায়িত্ব নেয় তার সই মা । নিজের বি.এ পাশ ছেলের সাথে বেগমের বিয়ে দেয়। শাশুড়ি ও স্বামী আজিজের আদর স্নেহে বেগম সুখী হলেও তার এ সুখ বেশিদিন সইলো না । দুই বছর পর স্বামী-শাশুড়ির মৃত্যুর পর সীমাহীন নির্যাতন নেমে আসে এই অনাথ মেয়েটির উপর । আত্মীয় স্বজনরা দরিদ্র অনাথিনী বেগমের অভিজাত বংশে বিয়ে মেনে নিতে পারে নি । এবার একা পেয়ে সেই সুযোগটা কাজে লাগায় । অসহায় বেগমের জীবন দূর্বিসহ করে তোলে আত্মীয় স্বজন এবং অনুদার গ্রামবাসী। অসহ্য গঞ্জনায় অতিষ্ট হয়ে বেগম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে 'খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেয়, তা না হলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায় ! তোর যদি মেয়ে হয় সলিমা তাহলে তখনি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস বুঝলি ? নইলে চিরটাকাল আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।'[১০]

এই আক্ষেপ, এই অন্তর বেদনা কেবল বেগমের নয় এ যেন সমস্ত বিধবা নারীর অন্তর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস । স্বামী হারা নারী শিকড় ছেঁড়া গাছের মত অর্ধমৃত । বেগমের উক্তির মধ্য দিয়ে নজরুল 'বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হাহুতাস হুতাশীর' কেই প্রকাশ করেছেন।ব্যক্ত করেছেন- বিধবাও বুকের কন্দরে লালন করে মৃত স্বামীর জন্য ভালবাসা অপরিমেয়ে প্রেম । 'নিকা ' বা দ্বিতীয় বিয়েকে বেগম মনে করে প্রথম স্বামী এবং তার প্রেমকে অপমান করা।[১১] তার মতে মানুষ আর মৌলবী, হৃদয় আর শাস্ত্র এক নয়।বেগম হৃদয়জাত সত্যকে মেনে নিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। এই গভীর প্রেমবোধ যেমন তার প্রতি পাঠককে সহানুভূতিশীল করে তেমনি তার করুণ পরিনতিতে পাঠক হৃদয় বেদনাতুর হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

'শিউলী মালা ' (১৯৩১) নজরুলের শেষ গল্প গ্রন্থ । এ গল্পে রয়েছে বেশ কটি উল্লেখ যোগ্য গল্প । প্রথম গল্পের নাম 'পদ্ম গোখ্‌রো ' । এক অভিনব বিষয়ের উপর লেখা এর কাহিনী । গৃহবধূ জোহরার অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের সুধা পেয়ে বিষধর সর্পও বশ মানে । দুটি যমজ সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে মারা যাবার পর সন্তান স্নেহ বুভুক্ষা জোহরা শ্বশুর বাড়িতে ঘটনাচক্রে এক জোড়া গোখরো সাপের মধ্যে আবিস্কার করে হারানো সন্তানের মমতা স্পর্শ । সাপ দুটো হয়ে উঠে জোহরার সন্তানের প্রতীক, তৃষিত মাতৃ হৃদয়ের সান্তনা ।

মাতৃত্ব বোধ একটি মহৎ ও পবিত্র মানবিক অনুভূতি এটা কে না স্বীকার করে ? জোহরার এই অনুভূতি এটা কে না স্বীকার করে ? জোহরার এই অনুভূতি মানবকে ছাড়িয়ে বিষধর সাপকে পর্যন্ত বশীভূত করেছে । কিন্তু জোহরার যে মা, তার মাতৃরূপ স্বাভাবিক বা শাশ্বত নয়। সে মায়ের শাশ্বত রূপের বিকৃত রূপ । তার রুচিও বিকৃত তাই জোহরার গহনা চুরি করতেও তার বাধেনি ।

কবিতা এবং গল্পে মিলিয়ে এ যাবৎ নজরুল যত মাতৃচরিত্র অংকন করেছেন তার মধ্যে 'পদ্ম গোখ্‌রো ' গল্পে জোহরার মায়ের চরিত্রটি বিরূপ প্রকৃতির ।

'জিনের বাদশা ' একটি বিয়োগাত্মক প্রণয় উপাখ্যান। নায়ক আল্লারাখা নায়িকা চান্‌ ভানু, আল্লারাখা দুরন্ত-দুঃসাহসী তরুণ আর চান্‌ ভানু - 'চোখে মুখে কথা কয় মাঠে ঘাটে ছুটোছুটি করে আরিয়ল খাঁর জল ওর ভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চায় ।'[১২] এ হেন চান্‌ ভানুর প্রেমে পড়ে আল্লা-রাখা । চান ভানুকে পেতে প্রয়োগ করে বহু বিচিত্র কৌশল। কিন্তু তাদের প্রেম পরিনতির পর্যায়ে পৌছানোর আগেই বিয়ে হয়ে যায় চান্‌ ভানুর । চান ভানুকে হারিয়ে দুরন্ত প্রকৃতির আল্লারাখার স্বভাবেও পরিবর্তন আসে। তার এত সখের বাবরি চুল কেটে, ঘাড়ে গামছা, হাতে পাঁচনী নিয়ে লাঙল ঠেলে কৃষক হয়ে যায়। 'অগ্নিগিরি' গল্পের নায়ক সবুর নম্র, ভদ্র , নিরীহ । মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার জন্য আশ্রয় নিয়েছে নূর জাহানদের বাড়িতে । জায়গির থেকে পড়ালেখা করে সে । গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা অযথা তাকে উত্যাক্ত করে, সে বিরক্ত হয় না। কিন্তু নূর জাহানের কাছে এসব অসহ্য। দিনের পর দিনে লাঞ্ছিত হয়েও যখন সবুর প্রতিবাদ করল না তখন রাগে দুঃখে নূর জাহান সবুরকে কটু কথা বলে ধিক্কার দেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

এতে সুবরের মনের অগ্নিগিরি যেন জ্বলে উঠে লাভা উদ্গিরণ করতে থাকে। উত্তেজিত সবুর বখাটে ছেলেদের ঠাট্টা মশকরার প্রতিবাদ করতে গেলে ঘটনার আকস্মিকতায় একজন ছুরিকাঘাতে মারা যায়। সাত বছরের জেল হয়ে যায় সবুরের। নূর জাহানের মা মনে করে মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে তা থেকে নিস্কৃতি পেতে দেশ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়াই ভাল। তারা সবাই মক্কাশরীফ চলে যায়। নূর জাহান সবুরের প্রতি অনুরক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তা প্রেমে পরিণত হয় নি। তবে নূর জাহানের ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় মানোভাব তাকে উজ্জ্বল করেছে ।

'শিউলি মালা ' গ্রন্থের শেষ গল্প 'শিউলী মালা'। নায়ক তরুণ ব্যরিষ্টার আজহার প্রথম দর্শনেই বিস্ময় ভরা চোখে দেখেছিল নায়িকা শিউলিকে । শিউলী শুধু সুন্দরীই নয় সে সুশিক্ষিতা, সুগায়িকা এবং দাবা খেলায় পারদর্শী। পরবর্তীতে তারা দুজন দুজনার মনের কাছাকাছি হলেও প্রেমের বাঁধন তেমন সৃদৃঢ় হয় না । রাতের শিউলী যেমন ভোরেই ঝরে যায় তাদের প্রেমও তেমনি স্বল্পায়ূ বড় মৃদু। এ গল্পটি নজরুল এবং ফাজিলাতুন নেসার প্রেম পর্বের কথা খানিকটা যেন স্মরণ করিয়া দেয়।

কবিতার মত গল্পেও নজরুল নারীকে এনেছেন বহু বিচিত্র রূপে । এখানেও নারী কখনও সনাতন মূল্য বোধে উৎচকিত, কখনও প্রথার বাইরে নূতন চিন্তা চেতনায় সাহসী । বহু মাত্রিক বাস্তব কে ধারণ করে বিচিত্র পথে বিচিত্র মনোজগতে বিচরণ করেছে গল্পের নারীগণ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

(১) অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত - ' কল্লোলযুগ ', কলিকাতা ডি এম লাইব্রেরী । আষাঢ় ১৩৬৬, পৃঃ ২৪-২৫ ।

(২) ' আমার সুন্দর ' প্রবন্ধ নজরুল রচনাবলী - ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩২

(৩) নজরুলের কথা সাহিত্যে গদ্যরীতি - নজরুল প্রসঙ্গে। - ড. রফিকুল ইসলাম , নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯৮, পৃঃ ৮৪

(৪) 'ঘুমের ঘোরে' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৬৪৩

(৫) 'অতৃপ্ত কামনা' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৬৪৬

(৬) 'রাজবন্দীর চিঠি' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৬৪৬
(ক) পৃঃ ৬৫৫ - ৬৫৬ (খ) পৃঃ ৬৫৮ (গ) পৃঃ ৬৫৯।

(৭) 'মেহের-নেগার' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৬৯০

(৮) 'সাঁঝের তারা' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৬৯৫

(৯) 'রাক্ষসী' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৭০০

(১০) 'স্বামী হারা' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৭১৬

(১১) 'স্বামী হারা' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৭১৬

(১২) 'জিনের বাদশা' (গল্প) নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড - পৃঃ ৭৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের উপন্যাসে নারী

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কৈশোর জীবনেই গল্প লেখা আরম্ভ করেছিলেন একথা বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি শৈলজানন্দ লিখেছেন, 'আমরা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম ইস্কুলে পড়বার সময় । নজরুল লিখত গল্প আমি লিখতাম কবিতা '[১]। দেখা যাচ্ছে কথা সাহিত্যিক হবার আকাঙ্খা ও সাধনা নজরুলের কিশোর জীবন থেকেই ছিল। সেনা বাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় করাচী থেকে যে সব লেখা তিনি কোলকাতার সাহিত্য পত্রিকায় পাঠিয়ে ছিলেন তার মধ্যে গদ্য রচনাওছিল। যেমন 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'হেনা ' ইত্যাদি।

একটি ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে সৃষ্টিশীলতার বিচিত্র শাখায় বিচরণ করেছেন নজরুল। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে তাঁরসৃষ্টির সোনালী ফসল ফলেনি।

উপন্যাস লিখেছিলেন তিনখানা । প্রথম উপন্যাস 'বাঁধন হারা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে । এটি পত্রোপন্যাস । বাংলা ভাষায় নজরুলই সর্ব প্রথম পত্রোপন্যাস লিখেছেন। আঠার খানা পত্রের সমন্বয়ে উপন্যাসের আঙ্গিকে তিনি লিখেছেন সম্পূর্ণ নূতন পত্রাশয়ী উপন্যাস 'বাঁধন হারা ' ।

পত্রে উল্লেখিত কাহিনী থেকে জানা যায় করাচী সেনানিবাসের সৈনিক নূরুল হুদা তার বন্ধু রবিয়ল পরিবারের মাহিলা সদস্যদের কাছ থেকে পেয়েছে মায়ের স্নেহ-মমতা ভায়ের আদর অবিবাহিত দুই তরুণীর হৃদয় নিসৃত প্রেম। কিন্তু বাঁধন হারা ছন্নছাড়া স্বভাবের জন্য গৃহসুখ তার সয়নি বরং মহৎ জীবনের আশায় দেশ মাতার মঙ্গল কামনায় নূরুল হুদা সৈনিক জীবন বেছে নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে। নূরুল হুদার যুদ্ধে যাবার কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকেই পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু এটি পত্রোপন্যাস তাই এ উপন্যাসের যা কিছু ঘটেছে তা চিঠি পত্রের মারফতে রটেছে। রবিয়লের বোন সোফিয়া, শ্যালক মনুয়র, রবিয়লের মা, সোফিয়ার সই মাহবুবা, মাহবুবার মা, রাবেয়ার বান্ধবী সাহসিকার কয়েকটি পত্রে বাঙালী সমাজে নারীর অধোগতি ও পুরুষকর্তৃক নানা অনুশাসন শৃখলে আবদ্ধ করার কথা প্রকট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম নারীচরিত্র মাহবুবা । সে নূরুল হুদার প্রণয়ী। তার গুন বর্ণনা করতে যিয়ে রবিয়লের স্ত্রী রায়েরা উল্লেখ করেছে যে, মেয়েদের

Dhaka University Institutional Repository

যেসব গুন থাকা দরকার খোদা তাকে প্রায় সমস্তই ডালি ভরে দিয়েছে। এহেন সর্বগুন সম্পন্ন মাহবুবার সাথে নূরুল হুদার প্রেম উপলব্ধি করেই বন্ধু রবিয়ল এবং তার স্ত্রী রারেয়া চেষ্টা করে দুই জনকে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ করতে। বিয়ের কথা বার্তাও পাকাপাকি হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধু এবং বন্ধু পত্নীর আশা পূরণ করা নূরর পক্ষে সম্ভব হয় না । সে সংগোপনে হঠাৎ করে যুদ্ধে চলে যায়। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে মারা যান মাহবুবার পিতা। অভিমান হত , বিক্ষুব্দ মা মাহবুবাকে নিয়ে নিজের পিত্রালয়ে ভাইদের কাছে চলে যান।মাহবুবার মামারা চল্লিশ উর্দ্ধ জমিদারের সাথে তার বিয়ে দেন। কিছু দিনের মধ্যেই সে বৈধব্য বরণ করে। জীবনের উষালগ্নে এ রকম আঘাত মাহবুবাকে একজন ব্যাকুল ও সচেতন নারী হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। তার সচেতনতার মধ্যে ধরা পড়ে নারীর প্রতি পুরুষ শাসিত সমাজের নানা অসংগতি । যে সব অসংগতি নারীর প্রতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা অবহেলা অপমান এবং এসব অত্যচারের জ্বালা চিঠির মাধ্যমে লিখে জানায় 'সজনে ফুল' সখি সোফিয়াকে, সাহসিকাকে। নারীর প্রতি পুরুষের চাপিয়ে দেয়া নিগ্রহ আর পুরুষের অধিনে পরাধিনতার যন্ত্রনা মাহবুবার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে এ ভাবে -

'আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি। আমাদের নিজের ইচ্ছায় করার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনো - কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিন্ড। ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচারণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় কতম। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তক নাকি আমরা ঐ দাসী বৃত্তিই করে আসচি। কোন কেতাবে নাকি লেখা আছে পুরুষের পায়ের নিচে বেহেস্ত, আর সেসব কেতাব ও আইন কানুনের রচয়িতা পুরুষ! দুনিযার কোন ধর্মই আমাদের মত নারী জাতিকে এতটা শ্রদ্ধা দেখায়নি, এত উচ্চ আসনও দেয়নি কিন্তু এদেশের দেখা দেখি আমাদের রীতিনীতিও ভয়ানক সংকীর্নতা আর গোঁড়ামি ভন্ডামিতে ভরে উঠেছে।'[২]

নারীদের হীন অবস্থা সম্বন্ধে মাহবুবা আরো লিখেছে - 'আমাদের হাত পা যেন পিঠ মোড়া করে বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই । খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি ।'[৩]

Dhaka University Institutional Repository

নারী যে শুধু পুরুষ দ্বারাই নিগৃত হচ্ছে এমন নয়- মামার বাড়ীতে মাহবুবা মেয়ে মহলে হয়ে উঠেছে একটি মস্ত থুবড়ো ধাড়ি মেয়ে । সেখানে উঠতে বসতে কেমন গঞ্জনার মধ্যে দিন পাত করছে- তার হৃদয় ছোঁয়া বর্ণনা দিয়েছে চিঠিতে 'থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ের সাত চড়ে রা বেরুবে না । কায়াটিতো নয়ই - ছায়াটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না গলার আওয়াজ টেলিফোন যন্ত্রের মত হবে, কেবল যাকে বলবে সেই শুনতে পাবে, বাস! খুব একটা বুড়োটে ধরনের মিচকে মারা গম্ভীর হয়ে পড়তে হবে। থুবড়ো মেয়ে দাঁত বের করে হাসলে নাকি কাপাস মহার্ঘ হয়। কোন অলংকার তো নয়ই, কোন ভাল জিনিষও ব্যবহার করতে বা ছুঁতেও পাবে না । তাহলে যে বিয়ের সময় একদম ছিরি (শ্রী) উঠবে না। ঘরের নিভৃততম কোণে ন্যাড়া বোঁচা পুটুলি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে চুপসে বসে থাকতে হবে।'[৪]

মাহবুবা একজন অবিবাহিতা তরুণী। তার জবানীতে নজরুল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই অবরুদ্ধ চিত্রের বর্ননা দেওয়ার মাধ্যমে যে প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার করেছিলেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটাও অনেক বড় সহসের কাজ ।

নারীর ব্যক্তিত্ব, তার পছন্দ বা অপছন্দের মূল্যায়ণ পুরুষ শাষিত সমাজ কখনই করে না বলেই মাহবুবার মত একজন যোগ্য মেয়েকে চল্লিশ উর্দ্ধ বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিতে দ্বিধা নেই তার মামাদের । শুধু মাত্র অশিক্ষিত পুরুষরাই যে নারীদের অবরোধ করে রাখছে তাদের মতামতের মূল্য দিচ্ছে না তা কিন্তু নয়, এ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত পুরুষের ভূমিকাও কম নয়। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেও মনের দিক থেকে তারা উদার হতে পারেনি। মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে ধরে রাখার কারণে তাদের দ্বারাও নারী নিগৃহিত হয়। এ সম্বন্ধে মাহবুবার মূল্যায়ণ -

'আজ কাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছেন কিন্তু একে উচ্চ শিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেন না এরা যত শিক্ষিত হচ্চেন ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন, আমাদের মেয়ে জাতের উপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়ে যাচ্ছে । তাঁরা মহিষের মত গোঙ্গানি আরম্ভ করে দিলেও কোন কসুর হয় না । কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙ্গেয়ে পড়ে তা হলে তারা প্রচন্ড হুঙ্কারে আমদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন।'[৫]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কথা সাহিত্যে দেখা যায় কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশ প্রেমের নামে পরিবারিক জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়াছে । তাদের এই এক তরফা সিদ্ধান্তে নিগৃহিত হয়েছে নারী। 'বাঁধন হারার' নুরুল হুদা সেরকম একটি চরিত্র। 'মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ' এর প্রবক্তা নুরুল হুদা নারী প্রেমের মাধুরিমা নিঃশেষ করে স্বদেশ প্রেমের দিকে নিমগ্ন হয়েছে। কিন্তু সেখানেও পরিপূর্ণ ভাবে নিমগ্ন হতে পারে নি । তাই অতীতের মোহ এবং স্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে পত্রালাপেরত হয়েছে । কিন্তু এই পত্রালাপ তাকে মহৎ করেনি ।দেশ প্রেমিকের চোখে তার অপরাধ গৌণ হলেও নারীর কাছে তার এই মাহত্ম্য মূল্যহীন । নারী অসাধারণকে পাবার আগে সাধারণ কেই প্রার্থনা করে। মাহবুবাও তাই করেছে, 'আমরা চাই এই তোমাদের গড়া খাঁচার মধ্যেই একটু সোয়াস্তির সংগে বেড়াতে চেড়াতে যা নিতান্ত অন্যায়, যা তোমরা শুধু খাম খেয়ালির বশবর্তী হয়ে করে থাক সেই গুলো থেকে রেহাই পেতে। এতে আমরাও একটু মুক্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচবো, রাত্তির দিন নানান আগুনে সিদ্ধ আমাদের হাড়ে একটু বাতাস লাগবে ! তোমরা যে খাঁচায় পুড়েও সন্তুষ্ট নও তার ওপর আবার পায়ে হাতে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে রেখেচ টুটি টিপে ধরেচ - থামাও, এ সব জুলুম থামাও! তোমরা একটু উদার হও, একটু মহত্ত্ব দেখাও এতদিনকার এই সব এক চোখা অত্যাচারের সংকীর্ণতার খেসারতে একবিন্দু স্বাধীনতা দাও, - দেখবে আমরা আবার তোমাদের নূতন শক্তিদেব নূতন করে গড়ে তুলব । দেশ কাল পাত্র ভেদে যে টুকু দরকার আমরা কেবল তা-ই চাইছি ।'[৬]

সজনে ফুল সখি সোফিয়া নিজেও মাহবুবার এই 'বক্তিমেয়' সায় দিয়েছে । পুরুষের এসব অত্যাচার থেকে সে ও মুক্তি পেতে চায়।

বিয়ের পর মাহবুবার মনের অবস্থা আরো করুণ। তার বাঁচার সাধ পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে। রাবেয়ার বান্ধবী মিস সাহসিকা বোসকে লেখা চিঠিতে সে জানায়, 'বাচঁবার সাধ আমার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন করে জাঁতা-পেষা হয়ে মরবার প্রবৃত্তিও নেই আমার । মরতেই যদি হয় দিদি তাহলে সে সময় কাছে আমার চাওয়ার ধনকে না-ই পাই, অন্তত আমার চার পাশের দুয়ার জানালা গুলো যেন খোলা থাকে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবার মত বায়ূর যেন সেদিন অভাব না হয়, এই ধরণী মার মুখের পানে চেয়ে প্রাণ ভরে কেঁদে নেবার মত অবকাশ যেন সে

Dhaka University Institutional Repository

দিন পাই দিদি, এই টুকু প্রার্থনা করো - শুধু আমার জন্য নয় - আমরই মত বাঙলার সকল কুল বধূর জন্য ।'[৭]

এই খানে মাহবুবা চরিত্র অনন্য । সে শুধু নিজের সুখ কামনা করে নি। করেছে সারা বাঙলার কুল বধূর সুখ, স্বাধীনতা । অবরোধের জাঁতা কলে পিষ্ট মাহবুবা জীবনের অন্তিম সময়ে মুক্ত বায়ূতে শ্বাস নিয়ে মরতে চেয়েছে - তার এ চাওয়া সত্যিই হৃদয় ছুঁয়ে যায়, মর্মকে স্পর্শ করে। সমাজের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা অথবা অগ্রাহ্য করার সাধ্য তার ছিল না তাই সব কিছুকে নিয়তী বলে মেনে নিয়েছে । তবে তার মন সস্তা মানসিকতার কাছে বিকিয়ে যায় নি । ধনী স্বামী টাকাকড়ি গয়না দিয়ে ও মাহবুবার মন পায়নি।

সনাতন সমাজের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ, পরিবার পরিজনের প্রতি অভিমান, প্রেমিকা হৃদয়ের ব্যর্থ গ্লানির জ্বালা - সেই যন্ত্রনা কাতর অনুভব সব মিলিয়ে মাহবুবাকে করেছে অনন্যা । ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের প্রতিচ্ছবি যেন মাহবুবা । নজরুলের কল্পনার জীবন্ত মানস্ কন্যা।

'বাঁধন হারা ' উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখ যোগ্য নারী চরিত্র রাবেয়া। তার পরিচয় রবিয়লের স্ত্রী হিসাবে । ব্যক্তিত্বে, চিন্তা-চেতনার উদারতায় সে স্নেহময়ী গৃহবধু কে ডিঙ্গিয়ে অনেক অগ্রসরমান। নূরুল হুদাকে লেখা চিঠিতে সে যে বক্তব্য তুলে ধরেছে তাতে তার চিন্তার স্বচ্ছতা ধরা পড়েছে। শুধু দাম্পত্য জীবন যাপন করেই একজন নারীর জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে এটা সে মানতে পারে না - এর বাইরেও নারীর আরো কিছু করার আছে বলে রাবেয়া মনে করে। ব্যক্তিগত মতামত হলেও তার মন্তব্য সর্বজন গ্রাহ্য । সে লিখেছে, 'এ দেশের মহিলারা যখন সহধর্মিনীর ঠিক মানে বুঝতে পারবেন । স্বামীর দোষকে উপেক্ষা না করে তার তীব্র প্রতিবাদ করে স্বামীকে সৎপথে আনতে চেষ্টা করবেন। তখনই ঠিক স্বামী স্ত্রী সমন্ধ হবে। স্বামীকে আস্কারা দিয়ে পাপের পথে যেতে দেয় যে স্ত্রী, সেআর যাই হোক সহধর্মিনী নয় ।'[৮]

রাবেয়া চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের ফলে নারীর চিন্তা ভাবনায় যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার প্রায় সবগুলো রাবেয়া নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলিম মিলন আকাঙ্খা, ব্রাহ্ম সমাজে মেয়েদের অবরোধের শিথীলতা, সর্বোপরি তরুণ তরুণীর হৃদয় বিনিময়ে বাধা না দিয়া তাদের বন্ধনে আবদ্ধ করার মানসিকতা রায়োর স্নিগ্ধ মনকে উজ্জ্বল করেছে। নারী শিক্ষার গুরুত্বও রাবেয়া সচেতন ভাবে উপলব্ধি করেছে। তাই নিজে যেমন পত্র পত্রিকা এবং সাহিত্য পাঠ করেছে তেমনি মাহবুবা ও সোফিয়াকে লেখাপড়া শিখিয়ে স্বীয় কর্তব্য পালন করেছে।

নজরুল তাঁর অপরিসীম সৃষ্টি দক্ষতায় 'হেরেমের পুর স্ত্রী' কেও নব জীবন চেতনায় অনন্য সাধারণ করে তুলে ধরেছেন রাবেয়া চরিত্রের মাধ্যমে।

'বাঁধন হারা' র উজ্জ্বলতম নারী চরিত্র ব্রাহ্ম মহিলা সাহসিকা বোস। প্রগতিশীল নারী মুক্তি আন্দোলনের বলিষ্ট কণ্ঠ। সামাজিক কুসংস্কারের বেড়া ছিন্ন করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত। তার স্বচ্ছ চিন্তা মুক্ত মন, প্রগতিশীল দৃষ্টি ভঙ্গি তাকে করেছে অনন্য সাধারণ সাহসী নারীর প্রতিমূর্তি। একারণেই তার বান্ধবীরা অন্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় নানা বিশ্লেষণে তাকে ভুষিত, করে যেমন- প্রখ্যাত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হোমরা-চোমরা গ্রাজুয়েট তদুপরি অনুপমা সুন্দরী, বিদূষী, কলা-সরস্বতী ইত্যাদি। অতগুলো 'মর্দানী লেবাস' সত্ত্বেও বিশ্বের সব কিছু কোমলতা আর মাধুর্য দিয়া গড়া নারীর নারীত্ব তার কাছে মুখ্য। কেননা সে মনে করে, 'নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়। নারীই যদি পাষাণী হয়ে যায়, তবে যে বিশ্ব সংসার থেকে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তিই উবে যায়। আর বিশ্বও তখন কল্যাণ হারা হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মতই এক নিমেষে নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়। এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ। এ নারী হিম হয়ে গেলে বিশ্ব প্রাণের স্পন্দন ও এক মূর্হুতে থেমে যাবে।'[৯]

ধর্ম সম্বন্ধেও সাহসিকা দ্বিধাহীন স্বচ্ছ। তার মতে 'সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তণ সত্যের পর - যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনো রয়েছে এবং অনন্তে ও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি তখন আমি হিন্দু ,আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমিব্রাহ্ম। আমি তো কোন ধর্মের বাইরের (সাময়িক সত্যরূপ) খোলসটাকে ধরে নেই।'[১০]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সতীত্বের ব্যাপারেও তার চিন্তা ভাবনা সাধারণের মত নয়। সে বিশ্বাস করে 'সতীত্ব তো মনে।' মাহবুবাকে লেখা রাবেয়ার চিঠি থেকে জানা যায় 'প্রথমে জীবনেই সে বুকে মাত্র এক দাগা পেয়ে বিয়ে টিয়ে করেনি, চিরকুমারী থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।'[১১] প্রচলিত বিবাহ প্রথাকে সে সতীত্বনাশ প্রক্রিয়া বলে মনে করে তাই প্রচলিত বিবাহ প্রথাকে সে সমর্থন করেনি। এদিক থেকেও সাহসিকা তার যুগের প্রেক্ষিতে প্রচন্ড সাহসী । ১৯২৬ সালে শামসুন নাহারকে লেখা চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন, 'দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায় ? তাকেই চাইছেন যুগ দেবতা।'[১২] 'বাঁধন হারার' ব্রাহ্ম মেয়ে সাহসিকা যেন নজরুলের চাওয়া সেই দুঃসাহসিকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিবাদী নারী সত্তার জীবন্ত প্রতিনিধি ।

'বাঁধন হারা' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সনাতন নারী চরিত্রে আরোপিত হয়েছে নূতন নারী চেতনা। জোরালো ভাবে না হলেও প্রায় প্রতিটি নারী চাপা ক্ষোভে প্রশ্ন তুলেছে সমাজের নানা অসংগতির বিরুদ্ধে । নারীর প্রতি নজরুলের যে সহমর্মিতা, উদার মানসিকতা তারাই প্রভাবে বিশেষ করে তিনজন নারী রাবেয়া, মাহবুবা এবং সাহসিকা প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে চিঠি পত্রে ।

নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস এবং সবচে উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০)। 'পুতুল খেলার কৃষ্ণ নগরের' খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র, তাদের আট পৌড়ে জীবনের ব্যথা বেদনার মর্ম ছোঁয়া বাস্তব চিত্র নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে । বস্তিবাসী নিরন্ন মানুষের কথামালার পাশাপাশি রয়েছে খ্রিষ্টান মিশানারীদের দুরভিসন্ধি আছে অভিজাত শ্রেণীর সুখ দুঃখ । বিশাল এই উপন্যাসের উল্লেখ যোগ্য নারী চরিত্র দুইজন-একজন দরিদ্র বিধবা মেজ বৌ, আরেক জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা রুবি । দুইজনই স্বীয় চরিত্রে সমুজ্জ্বল। তবে নজরুল সৃষ্ঠ নারী চরিত্রের মধ্যে মেজ-বৌ উজ্জ্বলতম ।
'মৃত্যুক্ষুধার' মেজ-বৌ জীবন পূজারী -, জীবন সত্তার ধারক বাহক । ক্ষুধা, মৃত্যু দারিদ্র, বৈধব্যের মধ্যে থেকে ও সে ভেঙ্গে পড়ে নি । বুদ্ধির চমকে চৌকষ জবানীতে অনেক সংকট সে অনায়াসে উত্তরণ করেছে । প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার জানিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিধবা হবার পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে শাশুড়ির কাছেই ছিল। আপন বোন জীবিত থাকতেও বোন জামাই ঘাসু মিঞা ওরফে ঘিয়াসুদ্দীন মেজ-বৌকে বিয়ে করার জন্য পীড়া পীড়ি করে নানা প্রলোভন প্রস্তাব দেয় কিন্তু মেজ-বৌকে টানতে পারে না। তার শাশুড়ি এসব দেখে ছোট ছেলে প্যাঁকালের সাথে বিয়ে দিয়ে ঘরের বৌ- ঘরেই রাখতে চায়। প্যাঁকালের ভাবীকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। মিথ্যা অপবাদের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে প্যাঁকালে ঘর ছেড়েছে ভেবে মেজ-বৌ প্যাঁকালের পৌরুষ এবং সমাজের লজ্জাজনক এই ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'এই আবার পুরুষ, বেটাছেলে । এত বড় মিথ্যার ভয়কে সে উপক্ষো করতে পারলো না। যে মিথ্যা কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে । সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদের ছুঁড়ে মারলে না। অন্তত অবহেলার হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরই সামনে দিয়ে পথ চলতে পারলনা। শেষে কি না পালিয়ে গেল হার মেনে। কাপুরুষ ।'[১৩]

মেজ-বৌ এর উপলব্ধি- তার সমাজ শুধু গ্লানি, তিরস্কার এবং বিদ্রুপের বাণে জর্জরিত করতে পারে। মানুষের অসহায় মূর্হুতে, দুঃখে, দুর্ভোগে এগিয়ে আসে না। যেখানে খ্রিস্টান মিশনারীর সামান্য নার্স এগিয়ে আসে। তাই হৃদয় হীন স্বজাতির প্রতি প্রচন্ড ধিক্কার উঠে আসে তার কন্ঠে-'শুকিয়ে মরলেও কেউ সুধায়না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুমের মুখে । সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়।'[১৪]

এ মন্তব্য মেজ-বৌ এর অন্তর মথিত বেদর্নাতি। শুধু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা নয় । একটু সুখ স্বচ্ছন্দ জীবনের নূন্যতম চাহিদা মধ্যে সামান্য শান্তি নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকতে চেয়েছে মেজ-বৌ, কিন্তু পারেনি অবরোধ আবদ্ধ শ্বাসরোধকারী সমাজ প্রতিকুল পরিবেশে ফোলে তার জীবনী শক্তির উদ্দমকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দিয়েছে। কঠোর দারিদ্রের মধ্যে ও মুসলমান সমাজের কাড়া অনুশাসন স্বজাতির অসহযোগীতা অনমনীয়তায় বীত শ্রদ্ধ হয়ে মেজ বৌ খ্রিস্টান হয়ে যায় । কেন না তার এই দারিদ্র পীড়িত অসহায় জীবনে মিশনারীরা দেয় আলোক উজ্জ্বল জীবনের আশ্বাস, তাদের কাছে পায় মানবিক স্নেহ-শ্রদ্ধা। সাম্যবাদী আনসার মেজ বৌর ধর্মান্তরিত হবার কারণ জানতে চাইলে মেজ বৌ নিজেই বলেছে, 'আমি ত হঠাৎ খ্রীস্টান হইনি আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রীষ্টান করেছেন।'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখের খর তাপে তার জীবন তৃষ্ণা মরে যায়নি বরং দুঃখের কষ্টিপাথর নির্ণয় করেছে মেজ-বৌ নিখাদ সোনা। দুঃখ অভিজ্ঞতা তাকে পৌছে দিয়েছে জীবনের এক নুতন দিগন্তে। মুছে দিয়েছে তার নিত্যদিনের চেনা জানা আটপৌরে ঘর কন্যার জীবন। কিন্তু সে জীবনও বেশি দিন যাপন করতে পারে নি মেজ-বৌ। সন্তান হারানোর অপার বেদনা তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে।

শেষ পর্যন্ত সকল শিশুর মাঝে নিজের সন্তানকে পাবার সান্তনা খুঁজেছে। ক্ষুধাতুর শিশুকে খাইতে, তাদের আদর স্নেহে টেনে নিজের শোক কমাতে চেয়েছে। এতেই যেন তার নিবিড় প্রশান্তি। সন্তান বিহনে আত্মকেন্দ্রিক হয় নি মেজ-বৌ নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে বিস্তৃত সীমানায়। গরীব শিশুদের শিক্ষা দিয়ে শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করার সংকল্প আসলে মাতৃ হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবার আরেক বাসনা। যে বাসনা মেজ বৌ কে করেছে আরো অন্যন্যা।

'মৃত্যু ক্ষুধা' উপন্যাসের আরেক উল্লেখ যোগ্য নারী চরিত্র রুবি। প্রেমের জন্য ত্যাগের মহিমা স্থাপন করেছে সে। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত আনসারকে ভালবেসেছিল রুবি। কিন্তু তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষিত বাবা-মা মেয়ের অমতে আই,সি,এস, পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জমের সংগে তার বিয়ে দেন। বিয়ের একমাসের মধ্যে মোয়াজ্জমের মৃত্যু হয়। বিধবার পোষাক গায়ে ওঠে রুবির। এতে যে সে খুব একটা মনোকষ্টে আছে তা প্রকাশ পায়নি। মায়ের সামনেই সে আনসারকে বলছে- 'দেখ আনু ভাই যাকে কোন দিনই জীবনে স্বীকার করিনি কোন কিছু দিয়ে, সেই হত ভাগ্যেরই মৃত্যু স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে সারাটা জিন্দেগী ভরে নিজেকে এই অপমান করার দায় থেকে কী করে মুক্তি পাই বলতে পার?'[১৬] রুবি মনে করে তার স্বামী ভালবাসা চায়নি। 'সে চিয়েছিল আমাকে বিয়ে করে ধন্য করার দাবিতে বিলেত যাওয়ার পথ খরচা।'[১৭]

আভিজাত্যের অহংকারে অহংকারী বাবা-মা তার মতামতের তোয়াক্কা না করে তাকে বিয়ে দেন এবং বিধবা হবার পরেও পুনরায় বিয়ে দেবার পাঁয়তারা করলে রুবি আর 'বিয়ের ছুরিতে গলা রাখতে' চায়নি। শেষ পর্যন্ত রুবি তার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে। যখন জানতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

আনসার যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে তখন সমস্ত বন্ধন সমস্ত সংস্কার ছিন্ন করে চলে যায় ওয়ালটেয়ারে। নিজেকে সমর্পন করে মুমূর্ষ আনসারের সেবায়। একজন যক্ষারোগী যার ফুস ফুস পর্যন্ত পোকার কবলে সব জেনে শুনেও দিনরাত তার সেবা করে তার প্রেমময় কামনার কাছে আত্ম বিসর্জন করে। বুঁচিকে সে লিখেছে 'আমি পরি পূর্ণ রূপে তার ক্ষুধিত মুখে আত্মসমর্পন করলাম। যদি ও না-ই বাঁচে তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না। দুদিন আগে মরবে এইত। তাছাড়া এ মৃত্যু ত ওর একার নয়; ওর বুকের মৃত্যুজীবানু আমাকে ও আক্রমন করবে।'[১৮] চিঠিতে রুবি আরো জানায় সে ও মৃত্যুপথ যাত্রী। আনসারের সান্নিধ্য পেতে রুবি প্রচলিত সমাজ ব্যাবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছে এভাবেই। প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের মহিমা স্থাপনে রুবির ভূমিকা প্রশংসনীয় ।

নজরুল কথা সাহিত্যে পুরুষতন্ত্রের ক্লেদ, জবরদস্তী, খবরদাবির বিরুদ্ধে নারীরা প্রতিবাদী হয়েছে। পুরুষ তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে সফল হতে পারে নি। নারীর একানিষ্ঠতা, অবিচলতা বিভ্রান্তী থেকে রক্ষা করেছে। মৃত্যুক্ষুধার মেজ-বৌকে ভগ্নি পতি ঘিয়াসুদ্দীন, কুর্শিকে রোতো কামার চেষ্টা করে ও বিভ্রান্ত করতে পারে নি। নিজেদের জীবন কে স্বাধীন ভাবে চলিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়াসী হয়েছে । মেজ-বৌ খ্রীস্টান হয়েছে কিন্তু সে বলেছে, 'আমিত মেম সায়েব হতে আসি নি ভাই মানুষ হতে এসেছিলাম। আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মত শিকলি কেটে বেড়িয়ে পড়েছিলুম।'[১৯] মানুষ হবার এই আকাঙ্খা আলো-বাতাসহীন পরিবেশে প্রাণের অভাব উপলব্ধি করতে পারা সর্বোপরি তার থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় নূতন জীবনে ছুটে আসে এক নূতন অভিজ্ঞতা তা বলাই বাহুল্য। 'হৃদয় মনকে উপবাসী রেখে অন্যের বলি' হতে চায় নি রুবি। রুবি তার প্রেমের কাছে বলি হয়ে মৃত্যুর মধ্যে ও স্বতন্ত্র জীবনের আশ্বাস খুঁজেছে।

নজরুল উপন্যাসে প্রেমের পরাকষ্টায় এবং সাধনায় পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারীরা অধিক সংযমী। তারা তাদের প্রেমের ব্যর্থতা বা সফলতা নিয়েই সন্তুষ্ট। পুরুষের মত নব নব রোমান্স অনুভবের আশায় ছোটে নি । নজরুল তাঁর নবতর মানস চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে এই সব নারী চরিত্র কে করেছেন প্রতিবাদী, হোক না সে প্রতিবাদ অতি সামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের তৃতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা'(১৯৩১)। সন্ত্রাসী রাজনৈতিক পটভূমির উপর লেখা উপন্যাসখানি। বাংলা সাহিত্যে নজরুল সম্ভবতঃ প্রথম সন্ত্রাসীবাদ নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাস শুরু হয়েছে মেস এর বাসিন্দা একদল তরুণের নারী সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে। তরুণ কবি হারুণ 'তাহার হরিণ চোখে তুলিয়া কপোত কুজনের মত মিষ্টি করিয়া বলিল, 'নারী কুহেলিকা।'[২০] আমজাদ বলিল, 'নারী প্রহেলিকা।'[২১]
সদ্য বিবাহিত তরুণ আশরাফ বলিল, 'নারী অহমিকা।'[২২] উপন্যাসের নায়ক উলঝুলুল বা জাহাঙ্গীর বলিল, 'নারী নায়িকা।'[২৩]

নারী সম্বন্ধে এত বিশেষণ প্রয়োগ করেও তারা তৃপ্ত নয় । হারুণ যেহেতু কবি সে কবিত্ব করে তার বক্তব্যকে আরো খনিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল, 'নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি বেলাভূমে দাঁড়িয়ে মহাসিন্ধু দেখার মত। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র যতটা দেখা যায়, আমরা নারীকে দেখি ততটুকু। সমুদ্রের জলে আমরা যতটুকু নামতে পারি, নারীর মাঝে ও ডুবি ততটুকুই । সে সর্বদা রহস্যের পর রহস্য জাল দিয়েই নিজেকে গোপন করছে এই তার স্বভাব।'[২৪]

বিপ্লবী জাহাঙ্গীর নারীকে শুধু নায়িকা আখ্যা দিয়েই তুষ্ট নয় । উদাহরণ টেনে বুঝাতে চেষ্টা করেছে তার মন্তব্যের সারাংশ। 'আমি জানি নারী মাত্রই নায়িকা । ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলেছে । ..... চতুর পুরুষের দেওয়া যত সব বিশেষণ কোনটাই তাকে মানায় না । তবে, নারী বেচারী সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয় তাই হবার জন্যে আমরণ সাধনা করেছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুশি করছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে পূজা না করলে ও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়ত তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলংকার পরিয়ে সুন্দর করে সিঁদুর কঙ্কন পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে নিরাভরণাকে করি বন্দনা।'[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীর নারীকে যেমন আশ্রদ্ধা করে তেমনি ভাল ও বাসে । ভালবাসলেও তার বিশ্বাস নারী যাদুকরী, নারীর মন ছলনায় কুটিল । অর্থাৎ নারী সম্পর্কে তার ধারনা মিশ্র, কোন স্থির বা আটল বিশ্বাস নারীকে নিয়ে জাহাঙ্গীরের নেই।

জাহাঙ্গীরের পিতা জমিদার। মানী লোক। তাঁর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর মাতা ফিরদৌস বেগম কৃতিত্বের সাথে সেই জমিদারী পরিচালনা করেন। জমিদারী পরিচালনায় তার অতি দক্ষতা দর্শনে লোক বলে, 'মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারীত চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায় ও চড়িতে পারে। তাহার শাসনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল না খাক তাহার জমিদারীর বড় বড় রুইকাতলা ও চুনোপুটি এক জালে বদ্ধ হইয়া একসাথে নাকানি চুবানী হইয়াছে । হিন্দু প্রজারা তাহাকে বলিত 'রায়বাঘিনী' এবং মুসলমানেরা বলিত 'খাড়ে দজ্জাল' (খরে দজ্জাল)।'[২৬] কিন্তু এমন বুদ্ধিমতী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মাতা ও জাহাঙ্গীরকে ভয় পান । জাহাঙ্গীর যখন জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপী গরিয়সী বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে।সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে শুনিল তাহার মাতা কলিকাতারই একজন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার । সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান ।'[২৭]

'সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে । তাহার জীবনের আনন্দ দীপালী কে যেন থাবা মরিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে।'[২৮]

এই কারণে নারীর প্রতি সে দ্বিধানিত্ব । তার জননীর প্রতি শ্রদ্ধাও দ্বিধাভিক্ত।

বিপ্লবী বীর পিণাকীর মাসিমা জয়তী দেবী । 'কুহেলিকা' উপন্যাসে তার উপস্থিতি স্বল্প সময়ের। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর, ব্যক্তিত্বে ও মাতৃত্বে মহীয়ান। লেখকের বর্ণনায় তার চোখ অতিরিক্ত প্রখর, 'মুখ পুরুষের মত তৃপ্ত, মহিমোজ্জ্বল'। পুত্র সম বোনপো পিণাকীর ফাঁসী হলে জয়ন্তী দেবী স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন।হয়ে ওঠেন 'বিপ্লীদের শক্তি স্বরুপা'। জয়ন্তী দেবীকে জাহাঙ্গীর মনে মনে বলিল নারী যদি নাগিনী হয়, তুমি নাগেরশ্বরী। জীবনে সে বুঝি এই প্রথম নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিল।'[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস আরো দুই জন নারীর সাথে জাহাঙ্গীরের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয় । একজন সাধারণ ঘরের মুসলমান ভূণী বা তাহমিনা অন্যজন হিন্দু, বিপ্লবী দলের চম্পা। ভূণী তার বন্ধু হারুণের বোন। বয়স পনের পার হয়েগেছে, চমৎকার জ্বল জ্বলে চোখ মুখ, সমস্ত শরীরে প্রখর বুদ্ধির দীপ্ত জোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। ছুটিতে হারুণের সাথে জাহাঙ্গীর তাদের গ্রামের বাড়িতে গেলে অভাবিত ভাবে ভূনীর সাথে জাহাঙ্গীর জড়িয়ে পড়ে।

আবার বিপ্লবী নারী চম্পার প্রতি ও সে অনুভর করে দুর্নিবার আকর্ষণ । চম্পা যেন 'শুক্লাচুর্তুদ্দশীর চাঁদ'। তার সৌন্দর্যে আছে মুগ্ধ করা গুন। 'এ রূপ নয় রূপের শিখা। রূপের চেয়ে তেজদীপ্ত আরো বেশি। চক্ষুতে অদ্ভুত জ্যোতি তাকানো যায় না।'[৩১] চম্পা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে - যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসীবাদী কার্যকলাপে। চম্পা যে মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, 'তাতে কেউ পুরুষ-নারী বলে নেই। সে খানে সকলে অগ্নি সখা '। এতদসত্বেও নিজের নারীত্ব সম্বন্ধে চম্পা সচেতন, 'আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ আর তোমাদেরই মত পুশুত্ব দিয়ে পশুকে জয় করবার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই । .... জাত ধর্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই পাইনি জীবনে । কিন্তু আমার নারী ধর্মত আছে।'[৩২] বিপ্লবী হলেই নারীর নারীত্ব, নারী ধর্ম বিসর্জন দিতে হবে এমন কথা নেই। চম্পার এই উপলব্ধি তাকে আরো বেশি জীবন্ত এবং বাস্তববাদী করেছে।

ভূণীর মা জাহাঙ্গীরের হাতে ভূণীকে সঁপে দিলেও জাহাঙ্গীর ভূনীদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় । কিন্তু তাকে একে বারে ত্যাগ করতে পারেনি। ভূণীর শর্ত ছিল জাহাঙ্গীরের জননী যে দিন এসে ডাকবেন সেদিনই সে তার কাছে যাবে। জাহাঙ্গীরের জননী ভূণীকে গ্রহণ করলেন কিন্তু দীপন্তর হয়ে গেল জাহাঙ্গীরের। জাহাঙ্গীর চম্পার কাছে অকপটে স্বীকার করেছে ভূণীর সর্বনাশ করার কথা, তাকে বিয়ে করা ছাড়া এ পাপের মুক্তি নেই । অনুসোচনার পরও ভূণী সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের মনোভাব, 'সে অতিমাত্রায় অহংকারী মেয়ে ..... বিষ নেই... কিন্তু ফণা আস্ফালন আছে।' শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর ভূণীকে তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত করতে চেয়েছে। কেননা সে মনে করে ভূণী ' অনেক দুঃখ পেয়েছে '।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের প্রথম দিকে মেসের আড্ডায় জাহাঙ্গীর বলেছিল নারী নায়িকা। শেষ পর্যন্ত বন্ধু হারুণের কথাই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলেছে 'নারী কুহেলিকা'। ভূণী - চম্পা দুই জনেই তার কাছে রহস্যময় কুহেলিকাচ্ছন্ন।

নজরুল তিনখানা উপন্যাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি তাঁর উপন্যাসে নারী চরিত্র অংকনে সনাতন দৃষ্টি ভঙ্গিকে ডিঙ্গিয়ে প্রগতিশীল, অগ্রসর মান চিন্তা চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চিত্রিত নারীরা কম বেশী সবাই হৃদয়ানুভূতি সম্পন্ন । আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল । তাঁর সমগ্র সাহিত্যেরমতো উপন্যাসেও নারীর তিনটি রূপ প্রধান্য পেয়েছে। নারীকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নারীর শক্তিরূপে, মাতৃরূপে এবং নারীর চিরন্তন প্রেমিকারূপে আবার গভীর রহস্যময় চরিত্রও এঁকেছেন নিপূণতার সাথে।

উনিশ শতকের নব জাগরণের প্রেরণায় নারীকে অবরোধ থেকে মুক্ত করে তাকে দেখতে চেয়েছেন মানুষের মর্যাদায় । সে সব নারী চরিত্র প্রতিবাদী, নিজের আবস্থান সম্পর্কে সচেতন আত্মবিশ্বাসী । নজরুল নারীর মধ্যে খুঁজেছেন বিদ্রোহিনী, খুঁজেছেন সাহসিকা। নারীর দেহ মনের স্বাধীনতা-সম অধিকার প্রশ্নে নজরুল বরাবরই সোচ্চার।

তাঁর যত অভিযোগ, অনুযোগ, অভিমান এবং অনেক ক্ষেত্রে আক্রোশ তা প্রেমিকা, ছলনাময়ী কুহেলিকা নারীর প্রতি । নজরুল নারীর কাছে আশা করেন একনিষ্ঠ প্রেম যা বাস্তবে পান না । তখনই তাঁর মনে হয় নারী রহস্যময়ী তার মন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এভাবেই বহু বিপরীত মতাদর্শে দোদুল্য মান নারী সম্পর্কিত নজরুল মানস। তবে আশা কথা এই যে, নজরুল যে ভাবে নারীকে অধীনতা, থেকে কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন এমনটি আর কেউ করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

(১) শৈলজানন্দ মুখোপধ্যায় 'আমার বন্ধু নজরুল' / কালিকাতা হরফ প্রকাশী ১১ই জৈষ্ঠ্য পৃঃ ১৮/১৯ ।

(২) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৪৭

(৩) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৪৭

(৪) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৪৯

(৫) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৪৯

(৬) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৮০১

(৭) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৩৮

(৮) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৯১

(৯) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৯৬

(১০) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৭৫

(১১) 'বাঁধন হারা' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৭৪৭

(১২) চিঠিপত্র (১৩নং চিঠি, নজরুল রচনাবলী-৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৭৭)

(১৩) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ৫৭৭

(১৪) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ ৫৭৪

(১৫) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ৬০৩

(১৬) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ৫৯৭

(১৭) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ৬১৬

(১৮) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ ৬৩৬

(১৯) 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুল রচনাবলী- ২য় খন্ড পৃ ঃ ৬২১

(২০) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ঃ ৬৩৯

(২১) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৩৯

(২২) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৪০

(২৩) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৪০

(২৪) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৪১

(২৫) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৪৬

Dhaka University Institutional Repository

(২৬) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৪৭

(২৭) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৮৬

(২৮) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৮৪

(২৯) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৪৬

(৩০) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৮৭

(৩১) 'কুহেলিকা' নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড পৃঃ ৭১৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ ও অভিভাষণে নারী

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন কবি। সাহিত্যে তিনি ফাঁপা কথার ফুল ঝুড়ি ছড়ায় নি। একে বারেই বাস্তব জীবনের প্রতিছবি তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় যেমন প্রতিফলিত, বোধ হয় তারচে কয়েক গুন বেশি বাস্তবাবতা সম্পন্ন তাঁর প্রবন্ধ এবং অভিভাষণ ।

নজরুলের রয়েছে চারটি প্রবন্ধ গ্রন্থ যেমন-'যুগবানী' 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' , 'দুর্দিনের যাত্রী' এবং 'রুদ্র মঙ্গল'। প্রবন্ধ গ্রহ গুলো প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে । সমাজ, রাজনীতি, সমসাময়িক সাহিত্য,তরুণের তারুণ্য সহ অনেক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন কবি।

নারী বিষয়ক চিন্তা ভাবনা ও এসেছে প্রবন্ধ সমূহে । নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধই নারীকে নিয়ে ১৩২৬ কার্তিক 'সওগাতে' লেখেন 'তূর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা '।

১৩২৫ বৈশাখের ভারতবর্ষে 'সঞ্চয়' বিভাগে শ্রী হেমেন্ত কুমার রায় তুর্ক মহিলা সম্পর্কে কিছু বিরূপ আলোচনা সংকলন করেন। তারই প্রতিবাদে নজরুল ইসলাম লেখেন এই প্রবন্ধটি । হেমেন্দ্র বাবু লেখেন, 'তুর্ক রমনীরা মোটেই সুন্দরী নয়'[১] এর বিপক্ষে নজরুল লেখেন, 'তুর্ক মহিলার মত এমন ভুবন ভুলানো রূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্যত আর পোড়া চোখে পড়লোনা-
'..... এমন ডাঁসা আঙ্গুর আর পাকা ডালিমের মত মিশানো লাবণ্য আর আয়নার মত স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধ হয় বেহেস্তেও দুস্প্রাপ্য। রমণী বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশি সুন্দরী হতে পারে তা তুর্কি তরুণী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।'[২]

কবি নজরুল তখনও কবি খ্যাতি লাভ করেননি তাই লিখেছেন, 'আমি যদি কবি হতুম তাহলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম-

'আগার ফেরদৌস্ বররুয়ে জামিন-আস্ত
হামিনাস্ত - ও হামিনাস্ত - ও হামিনাস্ত।।'[৩]

১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' লেখেন আরেকটি প্রবন্ধ নাম 'জননীদের প্রতি'। শিশুদের লালন পালন হাঁটা শিক্ষা বিষয়ে কিছু উপদেশ আছে এ প্রবন্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি সুদক্ষ ধাত্রী। মায়েদের মত প্রকৃতিও শিশু তথা মা'দের প্রতি স্নেহময়ী, এই সত্য কথাটি তুলে ধরেছেন প্রবন্ধে।

কয়েকটি অভিভাষণে নারী সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা চেতনার স্বচ্ছ ধারনা ব্যক্ত করেছেন নজরুল। ১৯৩২ সালে ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্য ভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে কবি নজরুল ইসলাম যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাতে আমাদের এই বাংলাদেশের অবরোধ প্রথা, অশিক্ষা, পুত্র কন্যায় বৈষম্য অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে তুলে ধরেন। তিনি বলেন

(১) 'আমাদের বাংলাদেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাস রোধ বলা যাইতে পারে।'

(২) 'ইহাদের বাড়ীতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষায় ভুগিয়া মরিতেছে। আলো বায়ুর অভাবে এই সব যক্ষা রোগ গ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীর সন্তান জন্ম গ্রহন করিবে কেমন করিয়া। ফাঁসির কয়েদিরও এই সব হত ভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে।'

(৩) 'কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা ' দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পরি না। আমাদের কন্যা-জায়া জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই অশিক্ষার গভীর কূপে ফেলিয়া হত ভাগিনীদের চির বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্ব প্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানিনা সর্ব প্রথম মুসলমান নর নহে - নারী। নারীদের দুঃখ বেদনা হতাশার চিত্র তুলে ধরেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নাই এই সব সমস্যার সমাধানের এগিয়ে আসতে বলেছেন তরুণদের।'

(৪) 'এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির বন্দিনী মাতা ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো বাতাস হইতে তাহা বিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।'[৪]

এছাড়া ও 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও' শীর্ষক আরেকটি অভিভাষণে কঠোর পর্দা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে নারীর প্রতি সহর্মমিতা প্রকাশ করেছেন। ১৩৪৩ সালে (বাংলাসন) ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে তরুণ ছাত্র দলের উদ্দেশ্যে কবি বলেন, 'সমাজের স্তরে স্তরে তার গোপনতম কোণে কোণে বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করো।'

কবি তরুণদের এই লজ্জা অপমানের গ্লানি থেকে মুসলিমকে বাঁচাতে আন্তরিক আহ্বান করেন। তিনি তরুণদের আরো স্মারণ করিয়া দেন---
'ইসলামের প্রথম ঊষার ক্ষণে সুবহ্ সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহ ধর্মিনী নয়, সহকর্মিনী হয়েছিলেন - যে নারী সর্ব প্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে - তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দূর্গে বন্দিনী করে । সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভকাজ, কল্যাণ উৎসব, আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন । তোমারা অনাগত যুগের মশাল বর্দার তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দরের চটের পর্দা। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন পথের দূরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প পেলব । কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইংগিত । সম্মান দেওয়ার নামে এই দিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি, আজও তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো জন্মেও এ জাতির আর মুক্তি হবে না।'[৬]

যে মুল্যবান বক্তব্য কবি অভিভাষণে দিলেন নারী সম্বন্ধে তাঁর এই অতলদর্শী প্রজ্ঞার ফল আজ বাংলার মেয়েরা খানিক হলেও ভোগ করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা এবং অন্যান্য রচনাতেই শুধু নয় ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে ও তিনি নারীর প্রতি তার আন্তরিক সহ মর্মিতা জানিয়েছেন । চট্টগ্রামের হবিবুল্লাহ বাহার এবং তার ছোট বোন শামসুন নাহার কে নজরুল খুবই স্নেহ করতেন। বই উৎসর্গ ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাদের সাথে কবির সম্পর্ক ছিল আগাগোড়াই মধুর । ১৯২৬ সালে কৃষ্ণ নগর থেকে কবি শামসুনাহার কে যে পত্র খানা লিখে ছিলেন তাতে ও নারীদের সম্বন্ধে তাঁকে আফসোস করতে দেখা যায়।

'আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে বারো হাতে লম্বা আটহাত চওড়া দেওয়াল । বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বার বার পরিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই, অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে বলছে আমরা বন্দিনী । দ্বার খোলার দুঃ সাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।'[৭]

'বাংলার আজিজ' খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের সহায়তায় এবং অনুপ্রেরণার শামসুন নাহার লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু তার নানা জানের মৃত্যুর পর কলেজে পড়া নিয়ে নাহারের অভিভাবকগন দ্বিধায় পড়েন । সে কথা জানতে পেরে কবি নজরুল তার স্নেহের নাহার কে বলছেন, 'অভিভাবক যিনিই হন তোমার, তিনিযেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পায় নি বলেই মনে হয়। তোমার যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্য, এও হয়তো সেই কারণেই। মিসেস আর,এস হোসেনের মত অভিভাবিকা পাওয়া অতি বড় ভাগ্যের কথা। তাঁকে ও যখন তাঁরা স্বীকার করে নিতে পারলেন না, তখন তোমার কি হবে পড়ার এ আমিভাবতে পরিনে।'[৮]

এই চিঠি উল্লেখিত আর.এস হোসেন হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যিনি নারী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত। আমরা জানি মণীষা বন্দনা কবি নজরুলের কাছে এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, অথচ তাঁর সমসাময়িক কালে নারী প্রগতির সাথে সম্পৃক্ত এমন একজন ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়া তাঁর সম্বন্ধে বা তাঁর মৃত্যুতে ও কিছু লিখলেন না নজরুল এটা সত্যিই ভাবতে

Dhaka University Institutional Repository

কষ্ট হয় । এই একটি মাত্র চিঠিতে নজরুল রোকেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

(১) 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' - নজরুল রচনাবলী - ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৪

(২) 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' - নজরুল রচনাবলী - ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৫

(৩) 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' - নজরুল রচনাবলী - ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৫

(৪) তরুণের সাধনা (অভিভাষণ) (১-৪ নং উদ্ধৃতি)-নজরুল রচনাবলী - পৃঃ ৯৬

(৫) বাঙলার মুসলিম কে বাচাঁও (অভিভাষণ)-নজরুল রচনাবলী - পৃঃ ১০৯

(৬) বাঙলার মুসলিম কে বাচাঁও (অভিভাষণ)-নজরুল রচনাবলী - পৃঃ ১০৯

(৭) শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি (১৩ নং চিঠি)-নজরুল রচনাবলী - পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭

(৮) শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি (১৩ নং চিঠি)-নজরুল রচনাবলী - পৃঃ ৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাহিত্যে নারী এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে তিনি কবি ও শুভানুধ্যায়ীর দৃষ্টিতে নারীকে দেখেছেন ফলে নারীর কর্ম এবং সৌন্দর্য সত্তাকে তুলে ধরতে পেরেছেন হৃদয় গ্রাহ্য করে । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কোন মহৎ কাজ শুধু মাত্র পুরুষ একা সম্পন্ন করতে পারে না । করলে সে কাজে সৌন্দর্য শ্রী থাকে না । তাছাড়া পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশে পুরুষের শক্তিমত্তার সাথে যোগ হয়েছে নারীর কল্যাণী রূপ। পাখি যেমন এক পাখা দিয়ে উড়তে পারে না, সমাজ তথা রাষ্ট্র ও তেমন শুধু পুরুষ নির্ভর হয়ে চলতে পারে না, সাথে চাই নারীর সহযোগিতা সহমর্মিতা। পুরুষের জীবনে প্রেম ও রোমান্টিক অনুভবের যোজনা করেছে নারী । নারী সকল কাজের অনুপ্রেরণা দাত্রী । সকল কর্মের সহযোগী শক্তি। সৌন্দর্যের ধারক বাহক হিসেবেও সমাজে নারীর ভূমিকা কর্মময়। নজরুল নারী জাতিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়ে তার বন্দনা করেছেন। সমকালীন অস্থির প্রতিবেশের বিবিধ টানা পোড়েন সত্বেও তাঁর নারী বিষয়ক কোন রচনায় অশ্রদ্ধার চিত্র ফুটে ওঠেনি। বরং তাঁর সংবেদন শীল মনের কারণে নারী হয়ে উঠেছে স্নেহে, শ্রদ্ধায়, আদরে, সোহাগ অতুলনীয়া । গল্প, কবিতা, উপন্যাসে নারীকে স্নিগ্ধ ও আত্মত্যাগী করে সৃজন করার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে নজরুল মানস এক বৃত্তে আটকে থাকেনি। মাঝে মধ্যে নিজের মতামতেরও বৈপরিত্য এসেছে।

সম অধিকার প্রশ্নে নারী যেমন- পুরুষের দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি নারী অধিকার সচেতন নয় - বলে নিজের ও নিজেদের বঞ্চিত করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোয় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে নজরুল নারীকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন । ভিতর থেকে দ্বার আটকে বসে না থেকে তাদের দরজা খুলে বাইরে আসতে বলেছেন। তাঁর অধিকাংশ নারী চরিত্র রূপায়ণ ঐতিহ্য গত হলেও উনিশ শতকের নব জাগরণের প্রেরণায় নারীকে তার পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও নজরুলের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় । নারী সমাজকে সভ্যতার অগ্র অভিযানের সাথে যুক্ত হবার একান্ত মানস প্রবণতা নজরুলকে প্রগতিশীল সাহিত্য ব্যক্তিত্বে পরিনত করেছে। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্র এবং নারী সম্পর্কিত চিন্তা চেতনা যুগ যুগ ধরে নারীকে এগিযে নিয়ে যাবে নারী আন্দোলনে, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়, নারীর আশা আকাংক্ষায়, সুখে আনন্দে, কর্মে-কল্যাণে আর্দশের চেতনায়দীপ হয়ে জ্বলবে। কেন না নজরুল অবরোধের দূর্গে আটক নারীদের দূর্গতির অবসান চেয়েছেন, বহুভাবে বহু রচনায়।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সম অধিকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি খুঁজে ফিরেছেন ইতিহাস, ঐতিহ্য, মিথ এবং ধর্মবিশ্বাস । যখন তিনি দেখেছেন 'ফিরদৌসের ফুল' 'ফিরসৌসের এক মুঠো প্রেম' নারী 'জড়ি শাড়ি মোড়া চকলেট' হয়ে 'হেরেম বাক্সে বন্দী' তখন স্বভাবতই তাঁর নারী দরদী মন কেঁদে উঠেছে । তিনি নারীর মধ্যে গৌরব এবং আত্ম মর্যাদার অনুভূতি সঞ্চারে তৎপর হয়েছেন । তিনি বিশ্বাস করতেন নারীকে উন্নত করার মাধ্যমেই দেশের কল্যাণ নিহিত।

নজরুল সাহিত্যের নারী সম্পর্কে কোন একক বা স্থির প্রত্যয় নেই। আছে বহুবিধ প্রত্যয়ের সহ অবস্থান । একদিকে আছে নারী মুক্তির জয়গান, অন্যদিকে আবেগের তাড়নায় তার বিরোধিতা । কোন দার্শনিক চিন্তা নয় সংবেদনশীল মনের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায় তিনি নারীকে শ্রদ্ধা করেছেন-- গেয়েছেন নারীর বন্দনা ।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

মূল গ্রন্থ ঃ

(১) নজরুল রচনাবলী (প্রথম খন্ড) আব্দুল কাদির সম্পাদিত। (নতুন সংস্কারণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে, ১৯৯৩ ।

(২) নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড) আব্দুল কাদির সম্পাদিত। (নতুন সংস্কারণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে, ১৯৯৩ ।

(৩) নজরুল রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড) আব্দুল কাদির সম্পাদিত। (নতুন সংস্কারণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে, ১৯৯৩ ।

(৪) নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খন্ড) আব্দুল কাদির সম্পাদিত। (নতুন সংস্কারণ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা মে, ১৯৯৩।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

(১) 'নজরুল নির্দেশিকা '- ড. রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৯।

(২) 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা ' - ড. রফিকুল ইসলাম, মল্লিকব্রার্দস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৯।

(৩) 'একালে নজরুল' - ড. আহমদ শরীফ, মওলাব্রার্দাস, ঢাকা, ১৯৯০।

(৪) 'নজরুলের কাব্য কবিতা' - ড. রফিকুল ইসলাম / 'নজরুল ইসলাম ঃ নানা প্রসঙ্গে' মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত / নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯১।

(৫) 'নজরুল প্রসঙ্গে' - ড. রফিকুল ইসলামদ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৮।

(৬) 'বাঙালী নারীঃ সাহিত্যে ও সমাজে ' 'এক্ষণ ' ৩৪ বর্ষ, ২০ খন্ড, ৩-৪ সংখ্যা ভারতীয় ১৪০১।

(৭) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া রচনাবলী , আব্দুল কাদির(সম্পা) বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

(৮) 'নজরুল প্রতিভা ' - মোবাশ্বের আলী, মুক্ত ধারা, তৃতীয় সংস্কার ১৩৯৫।

(৯) 'নজরুল সাহিত্য ' - মীর আবুল হোসেন (সম্পাদিত) ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্ককরণ ১৩৭২ (নজরুলের গল্প ও উপন্যাস), আবদুল হক।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা' - আতাউর রহমান - মুক্ত ধারা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৮।

(১১) 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' - মুজফ্ফর আহমদ ।

(১২) 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' - সৈয়দ আলী আশরাফ।

(১৩) 'নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা' - আব্দুল মান্নান সৈয়দ।

(১৪) 'নজরুল জীবনী ' - ড. রফিকুল ইসলাম বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ ২৫ শে মে ১৯৭২, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯।

(১৫) 'নজরুল কাব্য পরিচয়' - শ্রী মধুসূদন বসু। প্রথম প্রকাশ । আগষ্ট ১৯৭৫, সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্কারণ আগষ্ট ১৯৮৫।

(১৬) 'যুগ স্রষ্টা নজরুল' - মঈনুদ্দীন, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৬।

(১৭) 'অন্তরঙ্গ আলোকে নজরুল ও প্রমীলা' - আসাদুল হক, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৪/শ্রাবন ১৪০১।

(১৮) 'জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম বার্ষিকী -উদযাপন স্মারক গ্রন্থ' ১৯৯১-৯২।

(১৯) 'নজরুল জন্মশতবর্ষে বক্তৃতা মালা' - নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৫।

(২০) 'রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া - নারী প্রগতির একশো বছর' - গোলাম মুর্শিদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

(২১) 'নজরুলের ছোট গল্প শিল্প চেতনা' - তৌহিদ আহমদ, 'নজরুল গদ্য সমীক্ষা' - ড. মোহাম্মদ মজির উদ্দিন (সম্পাদিত), আদিলব্রার্দাস, ঢাকা, ১৯৭৮।

(২২) 'নজরুল উপন্যাসে নারী চরিত্র' - স্বপ্নারায়, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা (১৪ খন্ড) ভাদ্র ১৩৯৯।

(২৩) 'নারী মুক্তি আন্দোলন' - মারেকা বেগম, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৫।

(২৪) 'নজরুল প্রতিভা পরিচিতি' - অশো কুমার মিত্র, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯।

(২৫) 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' - আজহার উদ্দীন খান। ডি এম লাইব্রেরী,কলিকাতা, ৫ম সংস্করণ ১৩৮০।

(২৬) ' জ্যৈষ্ঠের ঝড়' - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

(২৭) ' গদ্য শিল্পী নজরুল' - সৈকত আজগর।

(২৮) ' নজরুল সমীক্ষা' - মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

(২৯) 'নজরুল অন্বেষা' - ড. রাজিয়া সুলতানা।